কর্ত্তাভজা ধর্ম্মের ইতিবৃত্ত

দেবেন্দ্রনাথ দে

সংযোজন ও সম্পাদনা

ড. সত্যব্রত দে

জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ, লিমিটেড

কলিকাতা-৯ ॥ কলিকাতা-১৯

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৫৭
মে ১৯৫০

গ্রন্থস্বত্ব : সম্পাদক

প্রকাশক
প্রকাশন বিভাগ
জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ্ লিমিটেড
১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

বিক্রয় কেন্দ্র
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০ ০০৯
১৭১।১।১বি, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ,
কলিকাতা-৭০০ ০১৯

মুদ্রণ
চণ্ডীচরণ পাইন
সত্য প্রেস
১০/২এ প্যারীমোহন সুর লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

উৎসর্গ

মাতৃ স্বরূপিণী পরম শ্রদ্ধেয়া
শ্রীশ্রীসরস্বতী দেবীর
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে

সূচীপত্র

গ্রন্থকারের নিবেদন

বাঙ্গালীর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস জানিতে হইলে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র বৃহৎ বিভিন্ন ধর্মান্দোলন এবং তৎসম্পর্কিত আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদির ইতিবৃত্ত অবগত হওয়া প্রয়োজন। যাঁহারা বাঙ্গালীর দীর্ঘ ধারাবাহিক ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত তাঁহারা সাধারণত বাংলাদেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত অল্পপরিচিত মতাদর্শগুলি সম্পর্কে খুব বিস্তারিত আলোচনা করিবার অবকাশ পাননা। অন্যদিকে জনশ্রুতি অবলম্বনে এই সমস্ত ধর্মমত সম্পর্কে অনেক অতিরঞ্জিত অলৌকিক কাহিনী অথবা মিথ্যা অপবাদ জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত থাকে। ফলে এই জাতীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রকৃত সত্য অবগত হওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। অনুসন্ধিৎসু জনসাধারণ ও ভক্তজনের মধ্যে প্রায়ই এ সম্পর্কে যে প্রচুর কৌতুহল লক্ষ্য করা যায়—তাহা চরিতার্থ করিবার উপায় তাই সহজে মেলে না। বাংলাদেশের এই জাতীয় অনতিক্ষুদ্র একটি ধর্মমত—শ্রীশ্রীআউলচাঁদ প্রবর্তিত কর্তাভজা ধর্ম। একদা অবিভক্ত বাংলার বিপুল সংখ্যক জনসাধারণের মধ্যে এই মতাদর্শের প্রবল জনপ্রিয়তা ছিল। আজও ক্ষীণ ধারায় এই ধর্মমতের প্রভাব বহু সংখ্যক ভক্তের মধ্যে বিদ্যমান। এই ধর্মমতের সহিত সম্পর্কিত "ঘোষ পাড়ার মেলা" একদা বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ মেলা ছিল। এখনও প্রতি বৎসর দোল উৎসব উপলক্ষে কয়েকদিন ধরিয়া এই মেলায় বহু সংখ্যক ভক্ত সমাগম হইয়া থাকে। এই জাতীয় অন্যান্য সমস্ত ধর্মমতের ন্যায় কর্তাভজা ধর্মের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তো দূরের কথা, সাধারণ জ্ঞাতব্য তথ্যাদি সম্পর্কেও সকলেই প্রায় অনবহিত। অথচ বাঙ্গালীর আনুপূর্বিক ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে এই ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে—এবং প্রবর্তনের যুগের সামাজিক পটভূমিকায় ইহার একটি বিশেষ তাৎপর্যও আছে। এই কর্তাভজা ধর্মমতের পূর্ণাঙ্গ এবং ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করা একান্তই অপেক্ষিত ছিল।

আমি দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যক্তিগতভাবে এই মতাদর্শের অনুগামী। অন্যান্য নানা দিক দিয়াও আমি ঘোষপাড়া ঠাকুরবাড়ীর সহিত যুক্ত ছিলাম। কর্তাভজা ধর্মের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করার ইচ্ছা বহুদিন হইতেই আমার অন্তরে ছিল। জীবিকার তাগিদে অন্যকার্যে ব্যাপৃত থাকায় এতদিন সেই ইতিহাস রচনায় হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই। বৃদ্ধ বয়সে অন্য কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া—কর্তাভজা ধর্মমতের ইতিবৃত্তের একখানি খসড়া প্রস্তুত করিয়াছি। আরো বিস্তৃত ইতিহাস পরবর্তী গবেষকেরা রচনা করিবেন।

যদিও আমি নিজে এই ধর্মমতের অনুগামী তবুও ইতিবৃত্ত রচনাকালে দৃষ্টিকে যথাসম্ভব অনাবিল রাখিয়া বাংলাদেশের ধারাবাহিক ধর্মান্দোলনের

পরিপ্রেক্ষিতে নিরপেক্ষভাবে আলোচ্য মতের ঐতিহাসিক ও সামাজিক তাৎপর্য নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সত্যানুসন্ধানই যেহেতু আমার উদ্দেশ্য তাই বিরুদ্ধবাদী নিন্দুকের মিথ্যাপবাদ অথবা ভক্তজনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাদ এই উভয় পথই আমি পরিহার করিয়াছি। এ সম্পর্কে পূর্বসূরী গবেষক গ্রন্থকারগণ যে সমস্ত মন্তব্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যথাসম্ভব সেগুলি বিচার করিয়া, যুক্তি তর্কের উপর নির্ভর করিয়া নির্ভুল ইতিহাস রচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই ধর্মমতের মাহাত্ম্য সম্পর্কেও অনেক কথা বলিবার আছে,—কিন্তু যেহেতু তাহা কেবলমাত্র ভক্তজনের বিশ্বাসের বিষয় আলোচ্য গ্রন্থে তাই সে-প্রসঙ্গ ইচ্ছা করিয়াই বাদ দিয়াছি। আমি কেবলমাত্র ইতিহাসের উপযোগী যুক্তিনির্ভর বিবৃতি ও প্রামাণ্য তথ্যাদি সন্নিবেশিত করিয়াছি। আমার বক্তব্য নির্ভুল কিনা তাহা জানিনা; শেষ কথা বলিবার অধিকার বা যোগ্যতা কোনটিই আমার নাই। আমি সে দাবীও করি না। তবে আমি ইচ্ছা করিয়া কোন তথ্য বিকৃত করি নাই বা কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া কোন মন্তব্য করি নাই। প্রাজ্ঞজনের প্রমাণ নজীরের উপর নির্ভর করিয়াই সিদ্ধান্ত গঠন করিয়াছি। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে পাঠক তাই এই ধর্মমতের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি একটি নির্ভুল ধারণা করিয়া লইতে পারিবেন। আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও হয়ত কিছু অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বিচ্যুতি অথবা অক্ষমতাজনিত অপূর্ণতা রহিয়া গেল। সহৃদয় পাঠকবর্গ সে সম্পর্কে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ কবিলে বাধিত হইব।

এই গ্রন্থ প্রণয়ণে নানাজনে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছে ঠাকুরবংশীয় স্বর্গীয় গোপালকৃষ্ণ পাল দেবমহান্ত এম, এ, বি, এল মহাশয়ের কথা। বহুদিন তাঁহার সহিত বিষয়টি সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করিয়াছি। ঠাকুর বংশীয় অধস্তন পুরুষ হিসাবে এ বিষয়ে অনেক অন্তরঙ্গ তথ্য তিনি অবগত ছিলেন। অন্যদিকে তিনি ছিলেন আধুকিন শিক্ষায় শিক্ষিত ও উদার দৃষ্টি সম্পন্ন। তিনিই আমাকে এই ধর্মমতের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে মূল ধারণা সৃষ্টিতে সহায়তা করিয়াছিলেন। অতঃপর বিভিন্ন গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া সেই ধারণাকেই আমি পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই অবসরে তাঁহার প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা-প্রণতি নিবেদন করি। যাঁহাদের গ্রন্থাদি হইতে আমি যদৃচ্ছ ঋণ গ্রহন করিয়াছি তাঁহাদের ঋণ আমি অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করিয়াছি। তাঁহাদের প্রতি আমার সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

গ্রন্থ প্রনয়ন ব্যাপারে সমস্ত দিক দিয়া আমাকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন আমার পুত্র শ্রীমান সত্যব্রত দে। জ্ঞাতব্য তথ্যাদির সন্ধান দিয়া, বিভিন্ন গ্রন্থাগার হইতে পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া দিয়া ও অন্য নানাভাবে সাহায্য

করিয়া তিনি আমার পরিশ্রম অনেকখানি লাঘব করিয়াছেন। কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থশালা ও অন্যান্য গ্রন্থাগার হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ ইত্যাদি কার্যে সহায়তা করিয়াছেন—আমার দৌহিত্র শ্রীমান শম্ভুনাথ দাস ও শ্রীমান কালীপদ সেন। পাণ্ডুলিপি কপি করার ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছেন শ্রীমতী উমারাণী বিশ্বাস, সর্বশ্রী সুধীরকুমার সিংহবাবু, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, গৌরচন্দ্র বাড়ুই, কানাইলাল পাল, মুরলীধর চৌধুরী, দুর্গাপদ গাঙ্গুলী, প্রকাশচন্দ্র নন্দী প্রভৃতি। ইহাদের সকলকে আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানাই।

মাতৃপ্রতিম শ্রীশ্রীসরস্বতী দেবীর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল সতীমায়ের মন্দির সংস্কার করিবার। তাঁহার স্নেহ ধারায় আমার সমস্ত জীবন নিষিক্ত। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা পূরণ করা ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই পুস্তিকা বিক্রয়লব্ধ উদ্বৃত্ত অর্থ সেই উদ্দেশ্যে ব্যয় করিতে মনস্থ করিয়াছি। যদি এ ব্যাপারে আমার পুস্তিকা মারফৎ সামান্য সাহায্যও হয় নিজেকে ধন্য মনে করিব।

গ্রন্থ মধ্যে ব্যবহৃত ব্লকগুলি সত্যধর্ম সেবক সংঘ [২৫২/ডি চিত্তরঞ্জন এভিনিউ নর্থ ; কলিকাতা-৬] এর সৌজন্যে প্রাপ্ত। তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। মন্দিরাদি সংস্কার বিষয়ে তাঁহাদের প্রচেষ্টা সার্থক হউক এই কামনা করি।

মুদ্রণ ব্যাপারে স্থানীয় প্রেষ্টিজ প্রিন্টিং প্রেসের সাহায্যও স্মরণীয়। শ্রীমান তুষারকান্তি ভট্টাচার্য ও শ্রীমান পৃথ্বীরাজ রায়ের আগ্রহাতিশয্য ও যত্নে এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হইল। এই উপলক্ষে তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। প্রেসের অন্যান্য কর্মী বিশেষ করিয়া শ্রীমান ভবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে আমার ধন্যবাদ।

দৃষ্টি শক্তির ক্ষীণতা ও শারীরিক অপটুতার জন্য মুদ্রণ পরীক্ষা কার্যটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইল না। বেশ কিছু মুদ্রণ অশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে। শুদ্ধিপত্র সংযুক্ত করিয়া কয়েকটি মারাত্মক অশুদ্ধির দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম। ছোটখাট ভুলগুলি পাঠকেরা শুদ্ধ করিয়া লইবেন। পরিশেষে ভক্ত ভাগবতজন ও ঐতিহ্য প্রেমী বাঙ্গালী পাঠকের প্রশ্রয় কামনা করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিলাম। ইতি—

১লা বৈশাখ : ১৩৫৭ — নিবেদক—

লালবাঁধ — শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে।

বিষ্ণুপুর : বাঁকুড়া

সম্পাদকীয়

বাংলার লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায়গুলি সম্পর্কে সাম্প্রতিককালে শিক্ষিতজনের মধ্যে আগ্রহ অনুসন্ধিৎসা দেখা যাচ্ছে। নানা দৃষ্টিকোন থেকে এদের পর্যবেক্ষণ ও ক্ষেত্রগবেষণা ইত্যাদি চলছে। অনেক সম্প্রদায় সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্যও আবিষ্কৃত হচ্ছে। বলা বাহুল্য বাংলার সামগ্রিক ইতিহাস রচনাকে সুষ্ঠু ও সুগম করার জন্যে বিষয়টি অপরিহার্য। আজ থেকে প্রায় দু'দশক পূর্বে মূলত এই দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দেশ্য নিয়ে এই জাতীয় লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায়গুলির অন্যতম প্রধান কর্তাভজাদের সম্পর্কে একখানি নাতিদীর্ঘ ইতিবৃত্ত রচনা করেছিলেন মদীয় পিতৃদেব স্বর্গত দেবেন্দ্রনাথ দে। বার্ধক্যজনিত অপটুতা ও অন্য নানাবিধ অসুবিধার জন্যে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় তাঁর অক্ষমতার বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন। বিনয়বশত তিনি তাঁর গ্রন্থকে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস না বলে ইতিহাসের খসড়া বলে অভিহিত করেছিলেন। খসড়া বা যে নামেই গ্রন্থখানিকে অভিহিত করা হোক, এ কাজে পথিকৃতের গৌরব দেবেন্দ্রনাথের। পূর্বে উইলসন, অক্ষয়-কুমার দত্ত প্রভৃতি তাঁদের গ্রন্থে কর্তাভজাদের সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করলেও কর্তাভজাদের সম্পর্কে ইতিবৃত্ত এই প্রথম। তাছাড়া, দেবেন্দ্রনাথ পূর্ণাঙ্গতার দাবী না করলেও গ্রন্থখানি তথ্য সরবরাহের দিক থেকে একেবারে অপূর্ণাঙ্গও নয়। পরবর্তীকালে অধ্যাপক সনৎকুমার মিত্রের সম্পাদনায় বিভিন্ন লেখকের রচনা সংবলিত 'কর্তাভজা : ধর্মমত ও ইতিহাস' নামে দুই খণ্ডে দুটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তাভজা সম্প্রদায় সম্পর্কে গবেষণা নিবন্ধও পি. এচ. ডি. উপাধির জন্য স্বীকৃত হয়েছে। তার কিছু গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয়েছে। ড. রতনকুমার নন্দীর 'কর্তাভজা ধর্ম ও সাহিত্য' নামক গ্রন্থটি আমি দেখেছি। গ্রন্থের ভূমিকায় দেবেন্দ্রনাথ আশা প্রকাশ করেছিলেন পরবর্তী গবেষকেরা আরো পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় অগ্রসর হবেন। তাঁর সে আশা সম্পূর্ণত পূরণ না হলেও সেদিকে কাজ শুরু হয়েছে এটা সুলক্ষণ। গ্রন্থকার জীবিত থাকলে তাঁর আরব্ধ কর্মের এই অগ্রগতিতে নিশ্চয়ই সুখী হতেন।

দেবেন্দ্রনাথ রচিত কর্তাভজা ধর্মের ইতিবৃত্ত ক্ষুদ্রগ্রন্থ। কিন্তু সম্প্রদায়ের উদ্ভব বিকাশ, সামাজিক প্রেক্ষাপট সাধনার মূলতত্ত্ব ও স্বরূপ, সংশ্লিষ্ট বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় ইত্যাদি সবদিকের আলোচনায় গ্রন্থখানি সমৃদ্ধ এবং আগেই বলেছি, যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ। বস্তুত দেবেন্দ্রনাথ তাঁর সীমায়িত সামর্থ্য ও অন্যান্য অসুবিধা সত্ত্বেও একক প্রচেষ্টায় যা করেছিলেন পরবর্তীকালের বিবিধ প্রচেষ্টায় তার থেকে খুব বেশি কিছু করা সম্ভব হয় নি। পরবর্তী প্রচেষ্টায় মূল্য হ্রাস এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য নয়, দেবেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টার প্রকৃত মূল্যায়নের জন্যেই এ

উক্তি। এই ধর্মমতের একান্ত অনুরাগী ভক্ত হয়েও গ্রন্থকার যেরকম মুক্তমন ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে বিষয়টির বিচার বিশ্লেষণ এবং যুগ ও সমাজের প্রেক্ষাপটে এই মতাদর্শের মূল্যায়নের চেষ্টা করেছিলেন তা অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবী রাখে।

পথিকৃৎ দেবেন্দ্রনাথের গ্রন্থখানি যত সমৃদ্ধই হোক এর উপযুক্ত প্রচার করা সম্ভব হয় নি। ঘরোয়াভাবে অল্প সংখ্যক পুস্তক মুদ্রিত করে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে ও অন্তরঙ্গ মহলে বিতরণ করা হয়েছিল। তারই একখণ্ড গ্রন্থে বিচিত্রবিদ্যা প্রসারে উদ্যোগী প্রকাশক সংস্থা জিজ্ঞাসার প্রয়াত কর্ণধাব শ্রীশকুমার কুণ্ডের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল এবং তিনি গ্রন্থটির উপযুক্ত প্রচার ব্যবস্থায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। গ্রন্থখানিতে আরো নতুন আলোচনা ও তথ্যাদি সংযুক্ত করে এবং বিশেষত আত্মোপলব্ধির কামনায় উন্মুখ, একান্ত উদার ও যুগোপযোগী লোকায়ত এই ধর্ম-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কেনই বা কিছু কিছু মনীষী কিছু তির্যক নিন্দাবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, কেনই বা এমন একটি মহৎ মতাদর্শ পূর্বেকার সেই বিপুল জনপ্রিয়তা থেকে বিচ্যুত হল তার মূল্যায়ন করে অর্থাৎ গ্রন্থখানিকে উপযুক্তভাবে সম্পাদিত করে প্রকাশ করার বিষয়ে শ্রীশবাবুর সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছিল। বস্তুত গ্রন্থপ্রকাশে তিনি খুবই আগ্রহী ছিলেন। তাঁর অকাল বিয়োগে তা আর সম্ভব হয় নি। কিন্তু বিষয়টি সম্পর্কে আমার আগ্রহ চিরদিন জাগ্রত ছিল। সাময়িক অসুস্থতা ও অন্য কিছু অসুবিধার জন্যে কিছু বিলম্বিত হল।

গ্রন্থ রচনা কালে গ্রন্থকারের সঙ্গে সম্পর্ক সূত্রে সমস্ত বিষয়টির সঙ্গে আমাকে জড়িত থাকতে হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথের অভিপ্রায় ও লক্ষ্য, তাঁর সাধ ও সাধনা সব কিছুর অনুপুঙ্খ আমার জানা ছিল। বিষয়টি নিয়ে বহুবার তাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। গ্রন্থ প্রকাশের পর ঘোষপাড়া ঠাকুরবাড়ীর দেবমহন্ত শ্রীযুত সত্যশিব পালের সঙ্গেও একাধিকবার আমার আলাপ আলোচনার সুযোগ ঘটেছে। এমনকি এ বিষয়ে পরবর্তী প্রচেষ্টা সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত গ্রন্থপ্রকাশের সঙ্গেও আমার পরোক্ষ যোগ ছিল। তাই বিষয়টি সম্পর্কে পূর্বে ও পরে যে সমস্ত আলোচনা লিপিবদ্ধ হয়েছে তার প্রায় সমস্তই আমার অনুধাবনের এবং নতুন করে ভাবার সুযোগ ঘটেছে। দেবেন্দ্রনাথের গ্রন্থখানির সম্পাদিত রূপ দিতে পেরে এবং তাঁর পরিশ্রমলব্ধ ফল সুষ্ঠু প্রচারের আলোকে সুধী সমাজে পরিচিতি লাভের সুযোগ পাবে এ সম্ভাবনা অবগত হয়ে আমি কৃতার্থ বোধ করছি।

সম্পাদনা কালে আমি গ্রন্থকারের মূল রচনায় হস্তক্ষেপ করিনি। বিশেষ কোনো বিষয়কে বিশদ করার প্রয়োজন বোধ করলে অথবা নিজস্ব বিচারবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কিছু ব্যাখ্যা বা নতুন তথ্য সংযোজনের প্রয়োজন হলে পাদটীকায় তা সংযোজিত করেছি। নতুন পাদটীকাগুলিকে চিনিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে সর্বদাই পাশে—'সম্পাদক' শব্দটি লেখা হয়েছে। তাছাড়া ভাষার

পার্থক্যও আছে। [নানা কারণে এ সংস্করণে ছবিগুলি ব্যবহার করা হয় নি।] গ্রন্থশেষে সংযোজনগুলি আমার নিজস্ব। 'সংযোজন-১'-এ স্তুতি নিন্দার পশরা : একটি মূল্যায়ন নামক রচনায় কর্তাভজা সম্প্রদায় সম্পর্কে নিন্দা ও প্রশংসার বিভিন্ন মন্তব্য সংকলন ও বিশ্লেষণ করে আমার নিজস্ব বিচারবোধ অনুযায়ী এই সম্প্রদায়ের উত্থান পতনের মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছি। দেবেন্দ্রনাথের গ্রন্থে কর্তাভজাদের গান সম্পর্কে খুব সামান্য আলোচনা ছিল। বস্তুত বিষয়টি নিয়ে পরেও তেমন কেউ বিস্তৃত আলোচনা করেন নি। 'সংযোজন-২' এ কর্তাভজাদের গান সম্পর্কে একটি আলোচনা যোগ করেছি। এরই অনুষঙ্গ হিসাবে নিদর্শন স্বরূপ ৩৫টি গান নির্বাচিত গীতি সংগ্রহ নামক সংযোজন-৩এ স্থান দিয়েছি। গানগুলির নির্বাচন সম্পর্কে সামান্য কিছু কৈফিয়ৎ প্রয়োজন। ছয় শতাধিক গানের ভিতর থেকে ৩৫টি মাত্র গান বেছে নেওয়া নিশ্চয়ই দুরূহ। স্বীকার করছি, নিজের মর্জির উপরই নির্ভর করতে হয়েছে। গ্রন্থমধ্যে এবং সংযোজন-২এ আলোচনা প্রসঙ্গে কিছু গানের আংশিক বা পূর্ণ উদ্ধৃতি আছে। এর সঙ্গে মিলিয়ে সংযোজন-৩এ উদ্ধৃত গানগুলি পড়লে কর্তাভজাদের গানের সব বৈশিষ্ট্য এবং ধারা সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা করে নেওয়া যাবে—এই দিকে দৃষ্টি রেখেই গানগুলি উদ্ধৃত করেছি। গান নির্বাচনে এটাই আমার মর্জির ভিত্তি। এঁদের যে সব গানের বই আমি দেখেছি তাতে গানগুলি গদ্যের মত ছাপানো। আমিও সেইভাবেই উদ্ধৃত করেছি। ৺মন্নুলাল মিশ্র প্রকাশিত 'ভাবের গীত' ৪র্থ সংস্করণের পাঠ আমি নিয়েছি। বানানের সামান্য আধুনিকীকরণ ছাড়া কোনো পরিবর্তন করিনি।

গ্রন্থ সম্পাদনায় ও প্রকাশনায় যাঁরা কোনো না কোনোভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁদের নামাবলী রচনা করলাম না। সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই শ্রীশবাবুর প্রতিষ্ঠিত প্রকাশন সংস্থা জিজ্ঞাসা এজেন্সিস লিঃ—কে, যাঁরা এই পুস্তক প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

সত্যব্রত দে

কর্তাভজা ধর্মের ইতিবৃত্ত

প্রথম অধ্যায়

কর্তাভজা ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ

বাংলাদেশের ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে 'কর্তাভজা সম্প্রদায়' নামে একটি বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ের অস্তিত্বের কথা অবগত হওয়া যায়। নিজেদের আরাধ্য দেবতাকে 'কর্তা' বলিয়া অভিহিত করে বলিয়া এই সম্প্রদায়ীদের নাম 'কর্তাভজা'। ঘোষপাড়াকে কেন্দ্র করিয়া উদ্ভব ও প্রসার এবং প্রতি বৎসর দোলপূর্ণিমা উপলক্ষে ঘোষপাড়ার মেলায় এই সম্প্রদায়ীদের সম্মেলন ঘটে বলিয়া ইহাদিগকে ঘোষপাড়া মতাবলম্বীও বলা হয়। আউলচাঁদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই সম্প্রদায়ীদের আউল বা আউলিয়া নামেও অভিহিত করা হয়।[১] এই সম্প্রদায়ীদের কিছু কিছু আঞ্চলিক নামও পাওয়া যায়। বর্তমান পূর্বপাকিস্তানের [অধুনা বাংলাদেশের] অন্তর্গত যশোহর খুলনা অঞ্চলের 'ভগবানিয়া' নামক মুসলমান জাতি এবং 'গুরুসত্য' নামক সম্প্রদায় বস্তুত কর্তাভজা সম্প্রদায়ীদের শাখা বিশেষ।[২] প্রধানত হিন্দুদের মধ্যে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলমানদের মধ্যে এই মতাবলম্বীদের সন্ধান মেলে। বাহ্যত ইহারা হিন্দু বা মুসলমান, কিন্তু ধর্মজীবনের সাধন পদ্ধতিতে এবং মতবিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইহারা একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত। বাঙ্গালী সমাজে এই সম্প্রদায়ীর সংখ্যা ঠিক যে কত—তাহা কোন আদমসুমারী রিপোর্ট হইতে জানা যায় না কারণ এই সম্প্রদায়ীরা নিজদিগকে হিন্দু বা মুসলমান বলিয়াই উল্লেখ করিয়া থাকে। তবুও বাংলাদেশে [যুক্তবঙ্গে] একদা এই সম্প্রদায়ীর সংখ্যা যে প্রচুর ছিল এবং আজও যে ইহাদের সাধন পদ্ধতির সক্রিয় অনুসরণকারীর সংখ্যা নিতান্ত কম নহে— এ অনুমানের যথেষ্ট ভিত্তি আছে। যিনিই এই মত সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিয়াছেন তিনিই সেযুগে এই মতাদর্শের জনপ্রিয়তার কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। উইলসন সাহেব তাঁহার "Hindu Religions or An Account of the Various Religious Sects of India" গ্রন্থে এই সম্প্রদায়ভুক্ত "Numerous disciples" এর উল্লেখ

১. আউল নামক একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের কথা আরো অনেকে বলেছেন। কিন্তু তাঁরাও স্বীকার করেছেন এঁরা বস্তুত কর্তাভজা এবং বর্তমানে এঁদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। ('...They (Auls) are otherwise known as Sahajia Kartabhaja...The followers of this sect are rarely seen nawadays'. The Vaisnava Sects of India: Swami Tattwananda. p. 55. প্রসঙ্গত এই অধ্যায়ের ৫ম অনুচ্ছেদ দ্র.—সম্পাদক।

২. যশোহর খুলনার ইতিহাস—সতীশচন্দ্র মিত্র : প্রথম খণ্ড পৃঃ ৮৪৪ এবং ৮৭৬।

করিয়াছেন।[১] Nadia District Gazetteer-এ এই সম্প্রদায় প্রসঙ্গে লেখা আছে "propagated……over all the districts of the Presidency Division." ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় লিখিয়াছেন যে ১৮৭১ হইতে ১৯০১ পর্যন্ত পর পর সেন্সাস রিপোর্টে কর্তাভজাদের সম্পর্কে যেরূপ দীর্ঘ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে অন্য কোন সম্প্রদায় সম্পর্কে সেরূপ নাই। সংখ্যা যাহাই হউক—সেযুগে এই ধর্ম-সম্প্রদায় এবং ধর্মমত যে বাংলাদেশে বিশেষ পরিচিতি লাভ করিয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।[২] কিন্তু কালের বিবর্তনে আজ ইহাদের কথা বিস্মৃতির অতলে লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। বাংলার বৃহত্তর সামাজিক ইতিবৃত্তে এই সমস্ত ছোটখাটো সম্প্রদায় ও স্বল্পখ্যাত মতবাদের ইতিহাসও একান্ত অপরিহার্য উপাদান। কোন্ বিশেষ সামাজিক পটভূমিকায় কোন্ বিশেষ বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে এই ধর্মমতের উদ্ভব ঘটিয়াছিল, এই সমস্ত ধর্ম-সম্প্রদায় গঠনে বাঙ্গালী মনের কোন্ প্রবণতা কার্যকরী হইয়াছিল, সে সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করা ও তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা তাই বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

যে কোন ধর্মান্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করিলেই পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় একটি বিশেষ যুগে তাহার জনপ্রিয়তা এবং যুগপরিবর্তনে তাহার পতনের ধারা লক্ষ্য করা যায়। বিশ্লেষণী দৃষ্টি লইয়া বিচার করিলে যুগ ও সমাজ জীবনের প্রভাবই এই উত্থান পতনের ইতিহাসের পশ্চাতে কারণ বলিয়া অনুধাবন করিতে অসুবিধা হয় না। সামাজিক প্রয়োজনে বিশেষ একটি যুগে বিশেষ কোন ধর্ম সাধনা প্রাধান্য লাভ করে—আবার সামাজিক বাতাবরণের পরিবর্তনে তাহার রূপান্তর ঘটে। এই রূপান্তরের অন্তরালে সমাজ ইতিহাসের একটি ধারাবাহিক অগ্রগতির পরিচয়ও লুকায়িত থাকে। কর্তাভজা ধর্মও একটি বিশেষ যুগের অনতি-পরিচিত একটি ধর্মসাধনা হইলেও ইহার মধ্যে যুগাগত ধারাবাহিকতা তাই অনতি-সংলক্ষ্য নহে। বরং বাঙ্গালী জীবনের চিরকালীন ঐতিহ্যধারায়—একটি বিশিষ্ট প্রবাহের নামই—কর্তাভজা ধর্ম।

১. Ward-এর লেখাতেই কর্তাভজাদের সম্পর্কে প্রথম লিপিবদ্ধ বিবরণ পাওয়া যায়। সেখানে শিষ্যসংখ্যা চার লক্ষাধিক বলা হয়েছে। যাঁরা কিছুটা বিরূপতা নিয়ে এঁদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তাঁরাও এঁদের জনপ্রিয়তার কথা স্বীকার করেছেন। অক্ষয়কুমার দত্তের উক্তি, 'লক্ষ লক্ষ লোক এই ধর্ম অবলম্বন করিয়াছে।' যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কর্তাভজা সম্পর্কে লিখেছেন, The most important of the class that may be called as Guruwor shippers of Bengal'। রমেশচন্দ্র মজুমদার 'বাংলাদেশের ইতিহাস'-এ লিখেছেন : ক্রমে এই সম্প্রদায়ের খুব সমৃদ্ধি হয় এবং ভক্তের সংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি হয়।'—পৃঃ ২৬৯। আরো আলোচনা সংযোজন-এ দ্রষ্টব্য। —সম্পাদক

২. সুকুমার সেন এবং উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কর্তাভজাকে পশ্চিমবঙ্গের একটি বৃহৎ সম্প্রদায় হিসাবে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গে উদ্ভূত হলেও পরে মধ্য ও পূর্ববঙ্গেও একদা এই সম্প্রদায়ের বিপুল প্রতিপত্তি ছিল। দ্র. পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বন ও মেলা (২য় খণ্ড) : অশোক মিত্র সম্পাদিত। পৃঃ ৩২৫—সম্পাদক।

দুই

কর্তাভজা সম্প্রদায় সম্পর্কে যেটুকু বিবরণ সংগ্রহ করা যায় তাহাতে জানা যায় যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আউলচাঁদ নামে জনৈক ফকির কর্তৃক প্রথম এই সম্প্রদায়ের গোড়াপত্তন হয় এবং পরে তাঁহার প্রধানতম শিষ্য রামশরণ পাল নামক জনৈক সদগোপ সাধক কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয়। আউলচাঁদের জীবনী সম্পর্কে যেটুকু তথ্য অবগত হওয়া যায় তাহাতে তাঁহার গুরু যে কে ছিলেন তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় না—এবং তিনি যে কোন্ মতাবলম্বী ছিলেন তাহাও জোর করিয়া বলা যায় না। তবে মনে হয় তিনি বাউল মতাবলম্বী কোন মুসলমান ফকিরেরই শিষ্য ছিলেন। সাম্প্রদায়িক বিভেদপীড়িত সমাজে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি সহজ মতবাদ প্রচারই ছিল আউলচাঁদের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি জীবনচর্যার সম্মার্গগামী কয়েকটি উপদেশ ও অতি সহজ অনাড়ম্বর সাধনপদ্ধতি সমন্বিত ঈশ্বরোপাসনার পথ নির্দেশ করিয়া একটি নূতন মতবাদ প্রচার করিলেন। এক হিসাবে মতবাদটি নূতন হইলেও মূলত ইহা একান্তভাবে নূতন নহে। মানুষ যখন সহজভাবে ঈশ্বরোপাসনার পথ পরিত্যাগ করিয়া আচার বিচারের মরুবালি রাশির মধ্যে পথ হারাইতেছিল, সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিভেদের সংঘাতে সমাজ জীবন যখন নানাভাবে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল তখন নূতন করিয়া আবার মানব-মাহাত্ম্যমূলক সহজ সাধনার বাণী শুনাইলেন আউলচাঁদ এবং অতি নিম্নস্তরে আর্তপীড়িত অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য সেই বাণীকে আরও সহজ সরল করিয়া তুলিলেন।[১]

মানব-সম্প্রীতি এবং সাম্প্রদায়িকতা হইতে মুক্তির কামনা যে এই সত্য প্রচারের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাহা সামান্য অনুধাবন করিলেই লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিকট গ্রহণীয় করিবার উদ্দেশ্যে এই

১. লেখকের এই মন্তব্য রীতিমত ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ। যুগ ও সমাজ পটভূমিকার প্রভাবে জাতিভেদ হীন সমন্বয়ের এবং অনাড়ম্বর ধর্মাচরণের তাগিদে এই সময়ে কেবল কর্তাভজা কেবল বাংলায় এবং বাংলার বাইরেও বহু সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছিল যাঁদের ধর্মীয় মূলনীতি ও আচরণবিধি প্রায় অনুরূপ। এই সব সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকটির প্রতিষ্ঠাতা বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান না হয় নিম্নবর্ণের হিন্দু। এদের শিষ্য সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতীয়। এইসব সম্প্রদায়ের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (১৩৭৬ সংস্করণ) ও স্বামী তত্ত্বানন্দের The Vaisnava Sects of India গ্রন্থ। আরো আলোচনা সংযোজনে দ্রষ্টব্য-
—সম্পাদক

ধর্মের বাণীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক শব্দাবলী এড়াইয়া কিছু কিছু নূতন শব্দ প্রবর্তনের চেষ্টা দেখা যায়। গুরু ও শিষ্য শব্দ দুইটিকে পরিহার করিয়া তাহার পরিবর্তে 'মহাশয়' ও 'বরাতি' শব্দ দুটি ব্যবহারের পশ্চাতে সম্ভবত এই মনোভাবই বিদ্যমান। পরবর্তীকালে এই মত হিন্দুদের মধ্যেই বেশি করিয়া প্রচলিত বলিয়া হিন্দু আচার অনুষ্ঠানের বাহুল্য ইহার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়—কিন্তু একদা বহু মুসলমান এই মতাবলম্বী ছিলেন এবং আজও তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নহে। এই ধর্মের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিলে—একদিকে ইহাতে বৈষ্ণব ধর্মের সহিত ইহার নাড়ীর যোগ যেমন লক্ষ্য করা যায় অন্যদিকে তেমনি ইসলামী সুফী প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। এই সম্প্রদায়ের ভক্ত শিষ্যেরা প্রবর্তক আউলচাঁদকে চৈতন্যদেবের অবতার বলিয়া বর্ণনা করেন এবং চৈতন্য চরিতামৃত ইত্যাদিকে নিজেদের ধর্মগ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। এই সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে যেমন বৈষ্ণব প্রভাব বিদ্যমান অন্যদিকে তেমনি পরম সত্তাকে 'কর্তা' বলিয়া অভিহিত করা মুসলমানী প্রভাবের চিহ্ন বহন করে।[১] কর্তাভজারা নিজেদের ধর্মকে 'সত্য ধর্ম' বলিয়াও অভিহিত করে। নীতি হিসাবে সত্য কথা বলা ইহাদের অবশ্য পালনীয় বিধি। কিন্তু সত্য ধর্মের 'সত্য' সম্ভবত নীতিগত সত্যকে বুঝায় না। 'সত্য' বস্তুত পরমাত্মার অপর নাম। 'সত্য' নামে ঈশ্বরকে অভিহিত করার মধ্যে সুফী মতবাদের 'অনল হক', 'হক' ইত্যাদি শব্দের প্রতিধ্বনি আছে বলিয়া মনে হয়। সুফীদের 'অনল হক'—সোহহং তত্ত্বের নামান্তর ; 'হক'—নিজের মধ্যেকার দেবত্ব। হকের প্রতিশব্দ—সত্য। কর্তাভজাদের 'সত্য' এবং সত্যনারায়ণ, সত্যপীর ইত্যাদি দেবতার পরিকল্পনায় মুসলমানী প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। তাহা ছাড়া কর্তাভজাদের শুক্রবার পালন, ত্রিসন্ধ্যার পরিবর্তে পাঁচবার ইষ্টনাম জপ ইত্যাদির মধ্যেও ইসলামী প্রভাব থাকা সম্ভব।[২]

কর্তভজা ধর্মের মধ্যে এই ইসলামী প্রভাব যেটুকু আছে—তাহার সামগ্রিক তাৎপর্য অনুসন্ধান করিতে তৎকালীন সামাজিক বাতাবরণ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। মুসলমান নবাবদের পতনের এই যুগে দেশে কাজীর বিচারের যে একান্ত প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল তাহার প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ

১. একমাত্র মুসলমানী সাহিত্যেই আরাধ্যকে কর্তা বলিয়া অভিহিত করা হয়। তুলনীয়: "প্রথমে প্রণাম করি এক করতায়"—আলাওল

২. অনেকে এই ধর্মের মধ্যে খ্রীষ্টানী প্রভাবের কথাও উল্লেখ করেছেন। শুক্রবার জুম্মাবার হিসাবে—ইসলামে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি খ্রীষ্টানমতে সৃষ্টির দিন। কর্তাভজা সম্প্রদায়ে শুক্রবারের গুরুত্ব খ্রীষ্টান অপেক্ষা মুসলমান প্রভাবজাত বলেই বেশি সমীচীন মনে হয়। তবে এঁদের দশ নিষেধবিধি (দ্র. ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় পৃঃ ১২২) এবং 'দায়িক মজলিশ' নামক অনুষ্ঠান যথাক্রমে Ten Commandments এবং confession of sin-এর অনুরূপ একথা স্বীকার্য। —সম্পাদক

আছে। নবাবী ফৌজের অত্যাচারেও এই সময়ে সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধিকে আরও তীব্র করিয়া তুলিয়াছিল। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সে জৌলুশও আর সমাজের মধ্যে ছিল না। নানা প্রকার আচার অনুষ্ঠানের গোঁড়ামি ও সংকীর্ণ ভেদ-বিভেদের আঘাতে সমাজ রীতিমত ক্ষতবিক্ষত হইতেছিল। বিশেষ করিয়া দুর্দশা ভোগ করিতেছিল দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত জনসাধারণ। তাহাদের মনে নূতন করিয়া আশার বাণী সঞ্চার করিবার উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িকতার ক্লেদমুক্ত সৌভ্রাত্র ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ নূতন মানব মাহাত্ম্যের বাণী শুনাইলেন আউলচাঁদ। একদা-যে দেশের অগণিত জনসাধারণের মধ্যে তিনি আলোড়ন উপস্থিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহার কারণই এই সৌভ্রাত্র ও প্রীতির বাণী। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এই সম্প্রদায় সম্পর্কে কিছু তির্যক ইঙ্গিত করিলেও ইহারা যে জাতি পংক্তিগত সাম্প্রদায়িক ভেদবিভেদ মানে না সে কথার উল্লেখ তিনি করিয়াছেন। উইলসন সাহেবও দ্ব্যর্থকতাহীন ভাষায় একথা স্বীকার করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ প্রভাবিত দেশে সদগোপ জাতীয় চাষী রামশরণ পালকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া হিন্দু মুসলমান সকল জাতীয় লোকের শিষ্যত্ব গ্রহণ ব্যাপারটির মধ্যেই জাতিভেদ প্রথার বিলুপ্তির আকাঙ্ক্ষা নিহিত ছিল। সকলেই সমান, এই ধারণাটিকে জীবন্ত করিয়া তুলিবার জন্য এখনও দোল মেলা উপলক্ষে সমবেত কর্তাভজাগণ এক পংক্তিতে আহার করাকে প্রধান তীর্থকৃত্য বলিয়া মনে করে। নবীনচন্দ্র সেন 'আমার জীবনে' বলিয়াছেন: "এখন যে Harmony of scriptures বা ধর্মমত সমূহের সামঞ্জস্য বলিয়া একটা কথা শুনিতেছি, দেখা যাইতেছে, এই রামশরণ পালই তাহা সর্ব প্রথম অনুভব করিয়াছিলেন তিনি বুঝিয়া ছিলেন। যে সকল ধর্মের মূল এক এবং এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে অধঃপতিত দেশে তিনি তাহা প্রথম প্রচার করিলেন।"

যুগের পটভূমিকায় বিচার করিলে এই নবোদ্ভূত ধর্মমতের উপযোগিতার আরও কিছু উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই বিশেষ সহজিয়া মতের উদ্ভবের আর একটি সুফল ছিল—তাহা মানব মহিমা প্রচার। সামাজিক অর্থনৈতিক সর্বাঙ্গীণ অধঃপতনের সেই যুগে মানুষ স্বকীয় মাহাত্ম্যের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া সেই অধঃপতনকে আরও তীব্র করিয়া তুলিয়াছিল। সেই যুগে তাই বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল এমন কিছু বাণীর—যাহার ভিতর দিয়া মানুষ উপলব্ধি করিতে পারে যে তাহার মধ্যেও দেবত্ব আছে। এই আশার বাণীই পর্যুদস্ত মানবতার সম্মুখে শুধু সান্ত্বনা নয় উৎসাহের আলোকবর্তিকা জ্বালিয়া ধরিল। আউলচাঁদ প্রবর্তিত কর্তাভজা ধর্মের বাণীতে সে যুগের মানুষ সহজিয়া চণ্ডীদাসের সেই উদাত্ত আহ্বান নূতন করিয়া শুনিতে পাইল:

শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

প্রত্যেক দেশের বিভিন্ন ধর্মের উদ্ভবের পটভূমিকা বিশ্লেষণ করিলে সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদ বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ও মতের উদ্ভবের পশ্চাতে সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদ তাই অস্বীকার করা যায় না। কর্তাভজা মতের মূলনীতি ও সাধনপদ্ধতি[১] আলোচনা করিলে এই মত ও পথের যুগোপযোগিতার কথা সহজেই অনুধাবন করা যায়। এই মত যে সে-যুগে একান্ত জনপ্রিয়তার সহিত গৃহীত হইয়াছিল এবং বিপুল সংখ্যক জনসাধারণের মধ্যে যে ইহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ নানা ভাবেই পাওয়া যায়। সে যাহাই হউক, এই মত ও পথের উদ্ভবে—সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদ এবং ইহার মূল উদ্দেশ্যের মধ্যে—বাঙ্গালীর স্বভাবসিদ্ধ সমন্বয়ের প্রয়াস ও সহজ সাধনার কামনার ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়। প্রচলিত আচার অনুষ্ঠান বিধি নিষেধের তীব্রতা এড়াইয়া সহজ সরল উপায়ে নিজের মধ্যেই আত্মগত ঈশ্বর লাভের চেষ্টা এবং বিভিন্ন মতের সাম্প্রদায়িকতা দূর করিয়া এক করিয়া দিবার বাসনা বাঙ্গালীর চিরাগত। সেই দিক দিয়া কর্তাভজা ধর্মের মধ্যে সমসাময়িক সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদ যেমন বর্তমান তেমনি ইহার মধ্যে লক্ষণীয় সুচির ঐতিহ্যের প্রতিফলন। বিষয়টি রীতিমত কৌতূহলোদ্দীপক। তাই বাঙ্গালীর সহজ সাধনার ধারা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিয়া এই ঐতিহ্য সূত্রটি অনুধাবন করিবার চেষ্টা করা যাক।

তিন

বাঙ্গালীর ধর্মসংস্কৃতি ও অন্যান্য সাধনার ধারা বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্টত দুটি প্রবাহ চোখে পড়ে—একটি আর্যপূর্ব বাঙ্গালী সাধনার ধারা এবং অপরটি আর্য সংস্কৃতির ধারা। বাঙ্গালীয়ানায় বাহ্যিক সমন্বিত রূপের অন্তরালে এই দুই উপাদানই সমানভাবে বিদ্যমান। শুধু বাঙ্গালী সংস্কৃতি নহে সম্ভবত আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করিলেও সর্বত্রই এই দুটি উপাদানের অল্পবিস্তর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাইবে। সে যাহাই হউক, বাঙ্গালী সংস্কৃতিতে যে-বিশিষ্ট একটি আর্যেতর সাধনপদ্ধতি কখনও পরোক্ষে কখনও প্রত্যক্ষে

১. পরবর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা হইতেছে তান্ত্রিক যৌগিক সাধনপদ্ধতি।[১] বাংলাদেশে বিভিন্ন যুগে গভীর দার্শনিক তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া অনেক মতবাদ প্রবর্তিত হইয়াছে কিন্তু কালের বিবর্তনে তান্ত্রিকতা ইত্যাদি বিভিন্ন উপাদানের সহিত সমন্বিত হইয়া বার বার তাহা নবরূপ ধারণ করিয়াছে। বাঙ্গালীর বেদাচার-প্রতিবাদী, জ্ঞান ও মনন মার্গ বিরোধী দেহ-ভিত্তিক যোগ সাধন পদ্ধতি 'সহজ সাধনার' ভিত্তি। যুগে যুগে এই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন ধর্মমতের সহিত মিশিয়া 'বৌদ্ধ-সহজিয়া,' 'বৈষ্ণব-সহজিয়া' ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটাইয়াছে। বাউল এবং বাউলের বিবর্তনে উদ্ভূত কর্তাভজা মতবাদের উদ্ভবেও ঐ একই দৃষ্টিভঙ্গী কার্যকরী হইয়াছে। অবশ্য প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই বিশেষ বিশেষ সামাজিক অবস্থা এবং পারিপার্শ্বিক অন্যান্য প্রভাবও বিদ্যমান। আলোচনার পূর্ণাঙ্গতার জন্য এই সহজ সাধনার ভিত্তি অর্থাৎ 'সহজিয়া' সম্পর্কে কিছু ধারণা করিয়া লওয়া আবশ্যক।

"সহজিয়াকে কোন ধর্ম সম্প্রদায় না বলিয়া ধর্ম সম্পর্কে একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীই বলা উচিত। আনুমানিক অষ্টম-নবম শতাব্দী হইতে সমস্ত মধ্যযুগ ধরিয়া বাংলা-দেশের বিবর্তিত বৌদ্ধধর্ম, কৌলধর্ম, নাথপন্থ, সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম ইত্যাদি সকল মত ও পথের মধ্যে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিষয়ে যেমন সাদৃশ্য ছিল তেমনি সাদৃশ্য ছিল ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে। সকলেই ছিলেন অল্প বিস্তর সহজিয়া, যদিও সহজিয়া বলিতে সাধারণ প্রচলিত অর্থে অনেক সময়ই কেবলমাত্র বৈষ্ণব সহজিয়াদিগকেই বোঝায়।

"অন্যান্য সহজিয়াদের মত বৌদ্ধ সহজিয়াদের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রধান বৈশিষ্ট্য ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান রীতিনীতি ইত্যাদির বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদী মনোভাব। তাঁহাদের মতে পরম সত্যলাভ আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি পালন অথবা জপতপ ধ্যান ধারণা জ্ঞানচর্চা ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। পরম সত্য কেবলমাত্র সহজতত্ত্বে দীক্ষা ও যোগাভ্যাসের মধ্য দিয়া অন্তরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। যোগাভ্যাসই মানুষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সহজ-পন্থা, কারণ কঠিন সংযম পালনের মধ্যে যে অস্বাভাবিকতা আছে তাহা মানুষকে রোগগ্রস্ত করিয়া তোলে।

১. তান্ত্রিক যৌগিক সাধনপদ্ধতি যে আর্যপূর্ব দ্রাবিড় জাতির দান সে বিষয়ে বেশিরভাগ পণ্ডিতই এক মত : "...a great deal of Indian religious and cultural traditions... is just non-Aryan translated in terms of Aryan speech...the ideas of Karma and transmigration, the practice of yoga, the religious and philosophical ideas centering round the conception of the divinity of Siva and Devi and Vishnu, the Hindu ritual of Puja as opposed to the Vedic ritual of Homa, all these and much more in Hindu religion and thought could appear to be non-Aryan in origin." Indo-Aryan and Hindi—Dr. S. K. Chatterjee.

সহজিয়ারা মানুষের সহজ স্বভাবকে পীড়িত না করিয়া স্বভাবসম্মত পন্থাতেই সত্যোপলব্ধির নির্দেশ দান করিয়াছেন। অবশ্য তাই বলিয়া তাহাদের মধ্যে যে নৈতিকতার অভাব ছিল একথা মনে করিবার কারণ নাই। সহজিয়ারা মানবিক বৃত্তির উপরই ধর্ম সাধনার পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন, এ কথার অর্থ এই যে, তাঁহারা স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিকে অবদমিত করিয়া ধ্বংস না করিয়া তাহাদের রূপান্তর ও উদ্গতির (Sublimation) কথা বলিয়াছেন। এই জন্যই তাহারা 'সহজিয়া'। তাহাদের ধর্মমত একদিকে যেমন সহজ অর্থাৎ সরল অন্যদিকে জীবনের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত তাই সহজ অর্থাৎ জন্মগত।"[১]

অবশ্য সহজিয়াদের মতে পরমসত্তার নামই 'সহজ'। সেই সহজের যাঁহারা উপাসনা করেন তাঁহারাই সহজিয়া। পরে কিন্তু সহজিয়া কথাটির তাৎপর্যে উপাস্য অপেক্ষা উপাসনা রীতির সহজতার দিকে বেশি দৃষ্টি পড়িয়াছে।

এই সহজিয়া ঐতিহ্য স্মরণাতীত কাল হইতে বাঙ্গালীর উত্তরাধিকার। অবশ্য ইহা যে কেবলমাত্র বাঙ্গালীরই সাধনা তাহা নহে। মধ্যযুগের ভারতীয় সন্ত-সাধক—কবীর, দাদূ ইত্যাদির সাধনার ধারাও সহজিয়া। তবে একথা স্বীকার্য যে বাঙ্গালী জীবনে এই সাধনার ধারা যতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে অন্যত্র ততখানি পারে নাই। সে যাহাই হউক, কিভাবে যে বাঙ্গালী তথা ভারতীয় জীবনে এই সহজিয়া ধারা প্রবাহিত হইল, ইহার কতটুকুই বা তান্ত্রিক-যৌগিক, কতটুকু পরিমাণে বা ইহাতে ঔপনিষদ প্রভাব আছে সে সমস্ত আলোচনা রীতিমত কৌতূহলোদ্দীপক হইলেও বর্তমান ক্ষেত্রে তাহার সবটা প্রাসঙ্গিক নহে। তাই আমরা শুধু কর্তাভজা তথা বাউল সাধনার উৎপত্তির ধারাবাহিকতা উপলব্ধির জন্য কেবলমাত্র বাংলাদেশে অনুসৃত সহজিয়া প্রবাহের গতি প্রকৃতি অনুধাবনের চেষ্টা করিব।

গুপ্তপূর্ব যুগে বাঙ্গালীর সাধনার ধারা কি প্রকারের ছিল তাহা নিঃসংশয়ে জানা যায় না। তবে অনুমান করিতে অসুবিধা হয় না যে সেই সাধনার ধারা ছিল অবৈদিক-আর্যেতর ধর্ম সাধনা। অবশ্য বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মারফৎ আর্য সংস্কৃতির সহিত বাঙ্গালীর সামান্য পরিচয়ের সূত্রপাত এই যুগেই ঘটিয়াছিল। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম বেদবিরোধী হইলেও আর্য মানসিক সংস্কৃতির পন্থানুসরণকারী। গুপ্তযুগ হইতেই বাংলাদেশে কিছু কিছু আর্যসাধনার অনুপ্রবেশ ঘটিতে থাকে এবং গুপ্ত সম্রাটগণের দুইশত বৎসরের শাসনকালের মধ্যে বৈদিক আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদির সাথে বাঙ্গালীর বেশ ভালভাবেই পরিচয় ঘটে। তবুও এযুগে পূজিত দেবদেবীর পরিচয় এবং সাধনপদ্ধতি বিশ্লেষণ করিলে হিন্দু তান্ত্রিকতার বাহুল্যই ধরা পড়িবে। গুপ্তযুগের পর পালযুগ (৭৫০-১১৬৫ খৃঃ অঃ) ছিল বৌদ্ধযুগ। এযুগের বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্ম—বুদ্ধদেবের প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম হইতে অনেকখানি পৃথক।

১. দ্র. চর্যাগীতি পরিচয় : শ্রীসত্যব্রত দে পৃঃ ৭০-৭২ (১ম সং, ৩য় সং পৃঃ ৬০-৬১)

তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতির অনুপ্রবেশের ফলে এই যুগের বৌদ্ধমত ক্রমেই সহজিয়া বৌদ্ধমতে পরিণত হইতেছিল। এই সহজিয়া বৌদ্ধমত পালযুগের সমন্বয় সাধনার ফল। "ধর্ম ও সংস্কৃতির তিনটি ধারা এখন একমুখী হয়। প্রথম আর্যেতর আদিম অধিবাসীদের ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারা। দ্বিতীয় বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির ধারা। তৃতীয় বৈদিক পৌরাণিক ব্রাহ্মাণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারা। প্রথম ধারায় অনেক আর্যেতর দেবদেবী ও অনেক ধর্মবিশ্বাস সংস্কার ও প্রথা স্বীকৃতি লাভ করিল। দ্বিতীয় ধারায় মহাযান বৌদ্ধধর্ম ও পূর্ববর্তী বৌদ্ধ সংস্কারের কাঠামোটি রাখা হইল। তৃতীয় ধারায় ব্রাহ্মণ্য পুরাণের দেবদেবী পূজা ধ্যান ধারণা এবং অন্যান্য সংস্কার ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করা হইল। এই তিন ধারার সমন্বয়ের ফলে উদ্ভূত হইল বৌদ্ধধর্মের এক নূতন রূপ—তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম—মন্ত্রযান.—বজ্রযান.—কালচক্রযান ও শেষে সহজযান বৌদ্ধধর্ম।[১] পাল রাজারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হইলেও সেযুগে সর্বধর্ম সমন্বয়ের একটি চেষ্টা শাসনকর্তাদের মধ্যেও ছিল। কিন্তু পরবর্তী সেন রাজারা ছিলেন বেদাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ্যধর্মের পোষক। সেন রাজাদের রাজত্বকালে বৌদ্ধ নিধনের অনেক ইতিহাস পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ্য বেদাচার রাজধর্ম ছিল বলিয়া অনেকেই এই সময়ে বাহ্যত এই ব্রাহ্মণ্য আচার-অনুষ্ঠান স্বীকার করিয়া লইয়াছিল কিন্তু এ যুগে পূজিত মূর্তি ও সাধনপদ্ধতি বিশ্লেষণ করিলে পৌরাণিক দেবদেবীর সাথে হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্রের মিশ্রিত এবং হিন্দু-তন্ত্রে রূপায়িত দেবদেবীর পরিচয় এবং বৌদ্ধ হিন্দুতন্ত্রের মিশ্র সাধনার কথাও জানিতে পারা যায়। অর্থাৎ বাহ্যত যাহাই হউক এ যুগেও মূলত বাঙ্গালী ছিল সহজিয়া। এই যুগেই বৌদ্ধ সহজিয়ার বিবর্তনে বৈষ্ণব সহজিয়া ধারার সূত্রপাত। এবং এই সময়েই "সাধারণ লোকদের মধ্যে অনেকে স্বাভাবিক ভাবেই বৌদ্ধ সহজিয়া হইতে বৈষ্ণব সহজিয়ায় রূপান্তরিত হইল।" (বাংলার বাউল ও বাউল গান: পৃ: ১২৭)। বাংলাদেশে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে। অনেক বাঙ্গালী এই সময়ে স্বতই রাজধর্ম গ্রহণ করিয়া খাঁটি মুসলমানে পরিণত হইল। কিন্তু বেশির ভাগই চাপে পড়িয়া মুসলমান হইয়াও পূর্ব মত সহজিয়া সংস্কার বিস্মৃত হইতে পারে নাই। তাহারাই ফকির হইয়া পূর্বের সেই আচার আচরণকে বজায় রাখিবার চেষ্টা করিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিক হইতে বাংলাদেশে সুফী মতবাদের অনুপ্রবেশের ফলে বাংলার সহজিয়ামনা মুসলমানরা যেন একটি আশ্রয় পাইয়া গেল। কারণ সহজিয়াদের সহিত সুফী সাধনার বিশেষ সাদৃশ্য ছিল।[২] চৈতন্যপরবর্তীকালে প্রেমধারণায়

১. দ্র. বাংলার বাউল ও বাউল গান—ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য পৃঃ ১৮৬

২. ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ পণ্ডিতেরা একথা স্বীকার করিলেও মণীন্দ্রমোহন বসু সহজিয়াদের সহিত সুফীদের সাদৃশ্য স্বীকার করেন না। দ্র. Post Caitanya Sahajia Cult of Bengal P. IX-X Introduction.

অবতারণায় বৈষ্ণব সহজিয়া মতবাদ একটি নির্দিষ্ট ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। আরও পরবর্তীকালে এই সহজ সাধনার ধারাই আউল বাউল কর্তাভজা ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতবাদের ভিতর দিয়া অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিয়াছে।

চার

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আমরা বাঙ্গালী সংস্কৃতিতে সহজিয়া দৃষ্টিভঙ্গীর ধারাবাহিকতার আলোচনা করিয়াছি। এই সহজধারায় যে বিশিষ্ট স্তরে আউল বাউল কর্তাভজাদের উদ্ভব তাহার একটু বিস্তৃত আলোচনা করা প্রয়োজন। বাউলদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন :—"In the Bauls of Bengal, therefore, we find the continuity of tne Sahajiya movement, the first systamatised form of which is found in the school of the Buddhist Sahajiyas. When we shall analyse the tenets of Bauls, as emboidied in their songs that are available to us, we shall find that the doctrines of the earlier Sahajiyas form the real background of their religion, although Sufiism of Islam have introduced a new spirit in it. (Obscure Religious Cults. P. 188). চিরাচরিত সহজিয়া সাধনা ধারার সহিত অন্য নানাবিধ মত ও পথের সমন্বয়ে যে বাউল মতবাদের উদ্ভব—এ সিদ্ধান্ত সর্ববাদী সম্মত। ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যও লিখিয়াছেন, "বাউল ধর্ম একটি সমন্বয়মূলক ধর্ম। ইহার মূল সাধনপদ্ধতি তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহার উপর শিবশক্তিবাদ, রাধাকৃষ্ণবাদ, বৈষ্ণব সহজিয়া তত্ত্ব প্রভৃতির প্রভাব পড়িয়াছে এবং ইহার সঙ্গে কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে ইহা একটি বিশেষ ধর্মরূপে গঠিত হইয়াছে।" [বাংলার বাউল ও বাউল গান পৃঃ ১২৬]।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে বাংলাদেশের শাসনভার মূলত সেন রাজাদের নিকট হইতে মুসলমানদের হাতে চলিয়া যায়। বাঙ্গালী চিরদিনই সমন্বয়বাদী। সব ধর্মকে মিলাইয়া মিশাইয়া শান্তিতে বসবাস করাই তাহাদের লক্ষ্য। বৌদ্ধ সহজিয়ারা তাই সেন আমলে বৈষ্ণব সহজিয়াতে পরিণত হইয়া হিন্দু হইয়াই বসবাস করিতেছিল। কিন্তু বাংলার সামাজিক ইতিহাস আলোচনায় মনে হয় সমাজে এই সহজিয়া জনসাধারণের বিশেষ কোন সম্মান প্রতিপত্তি ছিল না। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ইহাদিগকে শুধু যে

অবজ্ঞার চক্ষেই দেখিত তাহা নহে, নানা প্রকার সামাজিক অবিচারও ইহাদের উপর চলিত বলিয়া মনে হয়। ইহাদের জীবনের অন্তঃশীলা দুঃখ ধারার পরিচয় পাওয়া যায় চর্যাগীতি ও বৈষ্ণব সহজিয়া সঙ্গীতগুলির মধ্যে। এই দুঃখ অবজ্ঞার সহিত আবার মিলিত হইল নবাগত মুসলমান ধর্মের প্রভাব। মুসলমানী প্রভাব বস্তুত ছিল দ্বিমুখী। একদিকে ছিল ইস্লামি সৌভ্রাত্র ও সাম্যের আহ্বান; অন্যদিকে ছিল রাজশক্তির অত্যাচার ও কাজীর বিচার। এই শেষোক্ত কারণেও যে সেযুগে বহু সহস্র লোক ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নবধর্ম গ্রহণে বিশেষ করিয়া প্রলুব্ধ হইয়াছিল বর্ণহিন্দু দ্বারা অবজ্ঞাত সহজিয়া মনোভাবাপন্ন জনসাধারণ। মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াও কিন্তু তাহারা অনেকেই বংশগত প্রাচীন সংস্কার ও সাধন-পদ্ধতি ভুলিতে পারে নাই। এই সময়ে বাংলাদেশে ইসলামী সুফী মতবাদের প্রচার শুরু হয়। উত্তর ভারতে সুফী মতবাদ একাদশ শতাব্দীর শেষ হইতে প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেও—বাংলাদেশে ইহার প্রভাব ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের পূর্বে অনুভূত হয় নাই। সুফী মতবাদের সহিত সহজিয়া মতবাদের নানাদিকে গভীর সাদৃশ্য থাকায়—সহজেই তাহা বাংলার তথা ভারতীয় সহজিয়াদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। সহজ সংস্কারপরায়ণ ধর্মান্তরিত মুসলমানেরা সুফী মতবাদ আশ্রয় করিয়া সহজিয়া মুসলমান ফকির রূপে সমাজে পরিচিত হইলেন।

অন্যদিকে যে সমস্ত বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ না করিয়া এবং সমাজের নানাবিধ অত্যাচার সহ্য করিয়াও তাহাদের পূর্বাচরিত ধর্মমতে স্থির ছিল তাহারা চৈতন্যদেবের প্রচারিত প্রেম ধর্মের মধ্যে পরম আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। কিন্তু চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর—আচার বিচারের বেড়াজালে বৈষ্ণব সমাজের ভিতর হইতে উদারতা দূরীভূত হইয়া গেল। সহজ রসের আশ্রয় মনে করিয়া যাহারা চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল সেই অনাচারলাঞ্ছিত দরিদ্র সাধকগোষ্ঠী নূতন নূতন সহজিয়া সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া সহজ ধারা অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। পূর্বোক্ত সুফীবাদী মুসলমান ফকিরদের সাথে এই সদ্যোক্ত সহজিয়াদের ধর্মতত্ত্ব সাধনপদ্ধতি ইত্যাদির সাদৃশ্যের জন্য—উভয়ে মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গেল। এই মিলিত রূপের নামই বাউল সম্প্রদায়। আউল-বাউল বলিতে সাধারণত গৃহত্যাগী এক ধরণের বিশিষ্ট সন্ন্যাসী ফকিরকে বুঝাইলেও বাউল মতাবলম্বী গৃহী সাধকেরও অভাব নাই। বাউল মতবাদের বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনার অবকাশ এখানে নাই। উৎসাহী পাঠক এ বিষয়ে ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বাংলার বাউল ও বাউল গান, ক্ষিতিমোহন সেনের বাংলার বাউল, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের Obscure Religious Cults, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের হারামণি

ইত্যাদি গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা লক্ষ্য করিবেন। কর্তাভজা ধর্মের সহিত বাউলদের সম্পর্ক অনুধাবনের জন্য আমরা কেবল সূত্রাকারে সেগুলির উল্লেখ করিব।

১. আচার অনুষ্ঠান শাস্ত্র চর্চার বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদী মনোভাব।

২. গুরুবাদ বা সাধন পথে অগ্রসর হইবার জন্য গুরুর উপর একান্ত নির্ভরশীলতা এবং ক্রমে গুরুকে ইষ্ট দেবতা রূপে পূজা।

৩. দেহভাণ্ডেই ব্রাহ্মাণ্ড তত্ত্ব বা ভাণ্ডব্রহ্মাণ্ড-বাদ। সহজ সাধনায় পরমার্থকে বাহিরে কোথাও অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। সহজ মতে পরম সত্তার অবস্থান দেহভাণ্ডেই। এই তত্ত্বের ফলে একদিকে যেমন কায়-সাধনপদ্ধতির প্রাদুর্ভাব অন্যদিকে মানুষের দেহেই ভগবানের অবস্থান; —এই বিশ্বাসে মানুষের মহিমা বর্ধিত হইল এবং মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীরও উদ্ভব ঘটিল।

৪. পরম তত্ত্ব সহজ সুতরাং প্রবৃত্তি দমনের পথে নহে, জন্মগত সহজ স্বাভাবিকতার ভিতর দিয়া তাহা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করা উচিত।

৫. পরম তত্ত্ব উপলব্ধির পথ রূপ স্বরূপ তত্ত্ব—অর্থাৎ তান্ত্রিক যৌগিক ক্রিয়া পদ্ধতি।[১]

ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে "আনুমানিক ১৬২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বাংলায় বাউল ধর্ম এক পূর্ণ রূপ লইয়া আবির্ভূত হয়।" [বাংলার বাউল ও বাউল গান পৃঃ ২৮৯] বাউলদের সাধনার ধারা আধুনিক কাল পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। স্বভাবতই এই দীর্ঘ প্রবাহিত ধারায় কালানুগ বিবর্তন ও নানা শাখা প্রশাখার উদ্ভব ঘটিয়াছে এবং এই বিবর্তনের ফল হিসাবেই অন্যান্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত কর্তাভজা সম্প্রদায়েরও উদ্ভব ঘটিয়াছে। সুতরাং স্বতন্ত্র একটি সম্প্রদায় রূপে চিহ্নিত হইলেও বাঙ্গালীর ধর্ম সাধনার ইতিহাসে কর্তাভজা ধর্ম কোন ভূইফোঁড় মতবাদ নহে। এই ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য এবং বিধিনিষেধ ইত্যাদি[২] আলোচনা করিলে বাউল নামক বৃহত্তর সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদের আত্মিক যোগের কথা সহজেই ধরা পড়ে। বিচ্ছিন্নভাবে এই ধর্ম সম্প্রদায় সম্পর্কে যতটুকু আলোচনা হইয়াছে তাহাতে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পণ্ডিত গবেষকেরা সকলেই একমত। অক্ষয়-কুমার দত্ত মহাশয় ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' নামক গ্রন্থে বাউল মতবাদ হইতে উদ্ভূত অনেকগুলি সম্প্রদায়ের নাম করিয়াছেন। উইলসন সাহেবের গ্রন্থেও অনুরূপ কিছু সম্প্রদায় এবং তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীযুক্ত ক্ষিতি-

১. এই বৈশিষ্ট্যগুলির ব্যাখ্যার জন্য দ্র. Obscure Religious Cults P. 187-191 এবং বাংলার বাউল ও বাউল গান পৃঃ ২৯১-৩৬৮।

২. পরবর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

মোহন সেন এবং ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বাউল ধর্মের বিবর্তনে পরবর্তীকালে যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল, অক্ষয়কুমারকে অনুসরণ করিয়া তাহাদের নাম দিয়াছেন। উপেন্দ্রনাথ ইহাদের বিবরণ বিশেষ করিয়া, কর্তাভজাদের সম্পর্কিত বিবরণ কিছু লিপিবদ্ধ করিলেও ক্ষিতিমোহন পরবর্তী সম্প্রদায়গুলি সম্পর্কে কোন ঐতিহাসিক আলোকপাত করেন নাই। মণীন্দ্রমোহন বসুও 'Post Caitanya Sahajia Cult' নামক গ্রন্থে উইলসনকে অনুসরণ করিয়া কর্তাভজা সম্প্রদায়কে সহজিয়া বৈষ্ণবদের রূপান্তর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যাহাই হউক কর্তাভজা সম্প্রদায় যে বাউল মতবাদের সহিত সম্পৃক্ত এবং তাহার দেশ কালানুমত বিবর্তনের ফল এ সিদ্ধান্ত সর্ববাদী সম্মত।[১]

পাঁচ

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কর্তাভজা ধর্মমত ও সম্প্রদায়ের উদ্ভব এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগই ছিল ইহার গৌরবময় যুগ। তখনই সর্বাপেক্ষা বেশি সংখ্যক জনসাধারণের মধ্যে এই মতের ব্যাপক প্রসার হইয়াছিল। পরে নানা কারণে এই মতের জৌলুশ অনেকখানি নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। যে বিশেষ সামাজিক পটভূমিকায় ইহার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটিয়াছিল তাহাও পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই কর্তাভজা সম্প্রদায় হইতে কয়েকটি নূতন সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে বলিয়া জানা যায়। অক্ষয়কুমার দত্ত আউল নামে একটি সম্প্রদায়ের কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু আউল বলিয়া কোন ভিন্ন সম্প্রদায় ছিল বলিয়া মনে হয় না। ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন, "দত্ত মহাশয় আউল নামে যে সম্প্রদায়ের কথা লিখিয়াছেন সেরূপ সম্প্রদায় কোথাও আছে বলিয়া জানিনা।" [পৃঃ ৬১] আউল কর্তাভজাদের আর একটি নাম। প্রবর্তক আউলচাঁদের নাম হইতে আউল ও আউলিয়া নাম দুটি সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রযুক্ত হয়।[২] অক্ষয়কুমার 'রামবল্লভী' নামে যে সম্প্রদায়ের কথা লিখিয়াছেন তাহা এই কর্তাভজা সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত। হিন্দু মুসলমান

১. অক্ষয়কুমার প্রভৃতি প্রায় সকলেই কর্তাভজা প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলিকে 'চৈতন্য সম্প্রদায়ের শাখা' বা 'Vaisnava Subsects' বলে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত বর্তমান গ্রন্থাকারের—কর্তাভজা বাউলের বিবর্তনে উদ্ভূত—এই বক্তব্যের সঙ্গে পূর্বোক্ত বক্তব্যগুলির কোন বিরোধ নেই। সহজিয়া বৈষ্ণব, বাউল প্রভৃতি সব সম্প্রদায়ই যে মূল সহজিয়া সাধনার অন্তর্ভুক্ত বা বিবর্তন প্রসূত, আলোচনায় একথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।—সম্পাদক

২. পৃঃ ১-এর ১নং পা, টী, দ্র.—সম্পাদক

খৃষ্টান ইত্যাদি বিভিন্ন মতের সমন্বয়কে মূল লক্ষ্য স্থির করিয়া নূতনভাবে এই সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। তবে অক্ষয়কুমার ইহাদের সম্পর্কে গো-মাংস ভক্ষণের যে অপবাদ দিয়াছেন তাহার কোন ভিত্তি নাই। অন্যত্র রামবল্লভী সম্প্রদায়ের গো-মাংস ভক্ষণের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ১৮৩১ সালে সংবাদ প্রভাকরে ইহাদের একটি উৎসবের বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে দেখা যায় প্রায় পঞ্চ সহস্র লোক এক পংক্তিতে বসিয়া অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়াছিল।[১] বিবরণটি প্রত্যক্ষদর্শীর। গো-মাংস ভক্ষণের আয়োজন থাকিলে প্রত্যক্ষদর্শীর দৃষ্টি এড়াইত না, কারণ শুধু ভোজন নয় অন্য নানাবিধ ব্যাপারে এই সম্প্রদায়ের বিচিত্র আচরণের অনেক খুঁটিনাটি তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং সন্ত বাবাজী (তারাকিশোর চৌধুরী) একদা এই কর্তাভজা মতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে অবশ্য তাঁহারা নিজেরাই সম্প্রদায় কর্তা হইয়া নূতন সম্প্রদায় গঠন করিয়াছেন। তবে এই সমস্ত সম্প্রদায়ের আচার-অনুষ্ঠানের সহিত কর্তাভজা সম্প্রদায়ের আচার-অনুষ্ঠানের সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। প্রত্যক্ষত কর্তাভজা সম্প্রদায়ের রূপান্তর বলিয়া এই সম্প্রদায়গুলিকে অভিহিত করিতে পারা না গেলেও উহাদের উদ্ভবে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সহিত পরোক্ষ যোগ অস্বীকার করা যায় না।

পূর্ববর্তী আলোচনার আলোকে কর্তাভজা ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস পর পৃষ্ঠায় লিখিত চিত্র দ্বারা নির্দেশ করা যায়।

[১] সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৯।

সহজিয়া মনোভাব

|

তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম

|

সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম (সহজযান)

} পালযুগ, আনুমানিক দশম শতাব্দী

|

সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায় [সেনযুগে উদ্ভব, চৈতন্যপরবর্তী কালে বিকাশ] — সহজিয়া মুসলমান ফকির [মুসলমান আমলে উদ্ভব]

|

বাউল সম্প্রদায়
[সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে উদ্ভব]

|

কর্তাভজা — দরবেশ — সাঁই — সাহেবধনি ইত্যাদি

[অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ]

|

(প্রত্যক্ষভাবে) রামবল্লভী সম্প্রদায়[১] — (পরোক্ষভাবে)

(পরোক্ষভাবে): বিজয় যোগাশ্রম — সন্তবাবাজীর সম্প্রদায়

ছয়

এই উপলক্ষে কর্তাভজা ধর্মের সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি ও বর্তমান পতনশীল অবস্থা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক নহে। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় কর্তাভজা ও অনুরূপ ধর্ম সম্প্রদায়ীদের সম্পর্কে 'ব্যভিচার দোষ'

---

১. হজরতি, সাহেবধনি, তিলকদাসী প্রভৃতি সম্প্রদায়ও কর্তাভজাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্র. Vaisnava Sects of India : Swami Tattwananda pp. 70-72. সাহেবধনি সম্প্রদায় ও তাদের গান সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্র. সাহেবধনী ও তাহাদের গান—গ্রন্থ—সুধীর চক্রবর্তী—সম্পাদক

ইত্যাদি অভিযোগ করিয়া বিরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। অক্ষয়কুমার অনেক হিন্দু সম্প্রদায় সম্পর্কেই এরূপ ঐকদেশিকতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার মন্তব্যের অসত্যতা শুধু কর্তাভজা সম্পর্কে নহে—অন্য অনেক সম্প্রদায় সম্পর্কেই প্রমাণিত হইয়াছে। অক্ষয়কুমারের কথা বাদ দিলেও, এই সম্প্রদায়ীদের সম্পর্কে অনেকের মনেই যে কিঞ্চিৎ সন্দেহ, জুগুপ্সার ভাব বিদ্যমান সে কথা অস্বীকার করা যায় না। অন্যান্য অনেক তন্ত্রভিত্তিক সহজিয়া ধর্মের মত কর্তাভজা ধর্মেও গোপনীয়তা ছিল একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই গোপনীয়তার জন্যই অনেকে ইহাদের সম্পর্কে ব্যভিচার ইত্যাদির কথা অনুমান করিয়া লইয়াছেন। প্রথমদিকে কেবল সমাজের নিম্নস্তরের জনসাধারণের মধ্যে এই মতের প্রসার হওয়ায় উচ্চশ্রেণীর ভদ্রলোকেরা এই ধর্মমতটিকে খুব সুনজরে দেখিতেন না।[১] রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বাউলদের সম্পর্কে প্রীতি-পক্ষপাত প্রদর্শনের পূর্ব পর্যন্ত তাঁহাদের সম্পর্কেও জনসাধারণের ধারণা খুব উচ্চ ছিল না। রবীন্দ্রনাথের প্রীতি অনুসরণ করিয়া পরে অনেকেই বাউলদের সম্পর্কে অনেক গবেষণা করিয়াছেন এবং অনেক নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। কর্তাভজাদের এতদূর সৌভাগ্য না হইলেও—এই মতের দীক্ষিত ভক্ত না হইয়াও যাহারা এই সম্পর্কে কিছু অনুসন্ধান করিয়াছেন তাঁহারাই কর্তাভজাদের বিরুদ্ধে ঐ সমস্ত অভিযোগের কথা অস্বীকার করিয়াছেন। আচার্য দীনেশচন্দ্র 'বৃহৎবঙ্গ' গ্রন্থে কর্তাভজাদের কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে ব্যভিচার দোষের কোন উল্লেখ করেন নাই। আধুনিক কালে ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' নামক গ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায় অক্ষয়কুমারের মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন। এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনা আছে নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন' নামক গ্রন্থে। রানাঘাটের S. D. O. থাকাকালে নবীনচন্দ্র এই মেলার মধ্যে শিবির সংস্থাপন করিয়া মেলাটির সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যবস্থা করেন। তিন দিন এই মেলার মধ্যে অবস্থান করিয়া প্রকাশ্যে এবং গোপনে এই মেলার এবং ধর্মমতের বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া নবীনচন্দ্র রীতিমত শ্রদ্ধান্বিত হইয়া পড়েন

১. কিছু কিছু প্রভাব প্রতিপত্তিশালী উচ্চবর্ণের হিন্দু, যথা ব্রাহ্মণ জয়নারায়ণ ঘোষাল, ব্রাহ্ম শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হলেও, মূলত নিম্নবিত্ত, অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে ও নারী সমাজে এই ধর্মের প্রভাব ছিল বেশি, একথা স্বীকার্য। গ্রন্থ মধ্যে এর সামাজিক কারণও বিবৃত হয়েছে। উচ্চবিত্ত ও রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের মধ্যে এই সম্প্রদায় সম্পর্কে মুখ্যত বিরূপ ধারণাই বিদ্যমান ছিল এই কথাও সত্য। এঁদের সম্পর্কে আলোচনায় অনেকেই ব্যভিচার দোষের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তবুও একসময় বহু শিক্ষিত ভদ্রজনও এই ধর্মমতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরা সর্বদা সেকথা প্রকাশ করতেন না এবং লোকমধ্যে লোকাচার নীতির জন্য তা জানাও যেত না। হারাধন মুখোপাধ্যায়ের সত্যস্রোত গ্রন্থে উচ্চশিক্ষিত ভক্তমণ্ডলীর বিবরণ আছে। রামশরণের শিষ্য না হলেও এঁরাও কর্তাভজা।—সম্পাদক।

এবং স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ইহাতে নিন্দনীয় কিছু নাই। মেলা হইতে প্রত্যাবর্তন সময়ে আকস্মিকভাবে ট্রেনের একই কামরায় রবীন্দ্রনাথের সহিত নবীনচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়। রবীন্দ্রনাথ যখন শুনিলেন যে নবীনচন্দ্র কর্তাভজাদের মেলা হইতে আসিতেছেন তখন তিনি মন্তব্য করেন—"কর্তাভজাদের মেলা! শুনিয়াছি উহা বড় জঘন্য ব্যাপার।" উত্তরে নবীনচন্দ্র বলেন,—"অক্ষয়কুমার দত্তের 'উপাসক সম্প্রদায়' পড়িয়া আমারও সেই বিশ্বাস হইয়াছিল। কিন্তু তিন দিন মেলায় 'কর্তাগিরি' করিলাম, কই জ-ঘ-ন্য এই তিন অক্ষরের একটিও দেখিলাম না।" * * * অতঃপর নবীনচন্দ্র লিখিতেছেন, "তিনি তখন বড় আগ্রহের সহিত মেলার বৃত্তান্ত শুনিতে চাহিলেন। আমিও যাহা দেখিয়াছিলাম ও শুনিয়াছিলাম তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিলাম।" এই বর্ণনায় তাঁহারও যেন চক্ষু খুলিয়া গেল। তিনি বলিলেন, "আমার একটি প্রার্থনা, আপনি আমাকে যাহা বলিলেন, যদি তাহা একটু ক্লেশ স্বীকার করিয়া 'সাধনার' জন্য লিখিয়া দেন তবে আমার মত অনেকেরই একটা বিষম ভ্রম ঘুচিবে।"[১] এই ঘটনা হইতেই অনুমান করা যায় শিক্ষিত লোকেদের অনেকের মনেই প্রথমে এই ধর্মমত সম্পর্কে বিরাগ ও বিতৃষ্ণা ছিল কিন্তু পরে তাহাদের অনেকেই এ বিষয়ে অনুরাগী হইয়াছিলেন। এই মতের আচার অনুষ্ঠান যেরূপই হউক—ইহার যাহা দার্শনিক ভিত্তি তাহাতে বাউল-প্রেমী রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই মতবাদ সম্পর্কে অনুরাগী হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

এই সম্প্রদায়ের ভক্ত-শিষ্যের সংখ্যা যে কখন কত ছিল তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করিবার উপায় নাই, কারণ প্রথমত এই মতাবলম্বীরা ভিতরে আচারে অনুষ্ঠানে কর্তাভজা হইলেও—বাহিরের পরিচয়ে হিন্দু বা মুসলমান এবং দ্বিতীয়ত এই ধর্ম অনাড়ম্বর গোপনীয়তায় পালনীয় বলিয়া ইহার ভক্ত সাধকদের সন্ধান সহজে পাওয়া যায় না। তবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলাদেশের সর্বত্র—যে এই মতের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল—তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়—তৎকালীন মেলায় ভক্তবৃন্দের উপস্থিতি হইতে।[২] প্রথম দিকে দরিদ্র নিম্নবিত্ত জনসাধারণের মধ্যে এই মতের প্রসার ঘটিলেও—ক্রমে যে সে যুগের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই মতবাদ সম্পর্কে অনুরাগী হইয়াছিলেন—তাহা অনুমান করা যায়—ভূকৈলাসের মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের অনুরাগ হইতে। সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি জয়নারায়ণ ঘোষাল—এই ধর্মমতের তত্ত্বাদি অবগত হইবার জন্য তৎকালীন 'কর্তা'

১. নবীন রচনাবলী ৩য় খণ্ড, সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ পৃঃ ১৯০।

২. নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার হইতে জানা যায় এই সময় ঘোষপাড়া মেলায় প্রতিদিন দশ সহস্র জন সমাগম হইত এবং মেলা ১০ দিন পর্যন্ত চলিত। [১-এর পৃঃ ৩নং পা. টী. দ্র.—সম্পাদক]

দুলালচাঁদের নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন। বিভিন্ন সূত্র হইতে এই মতে দীক্ষিত বা অনুরাগীদের যতটুকু সন্ধান পাওয়া যায় তাহাতে বহু মানী গুণী ব্যক্তির নামও পাওয়া যায়।

নিন্দায় প্রশংসায় মিশ্রিত হইয়া একদা এই ধর্মমত বাংলাদেশে বিস্তৃত পরিচিতি লাভ করিলেও—আজ ইহার প্রভাব প্রতিপত্তি একেবারে নাই বলিলে চলে। ঘোষপাড়ায় দোল উৎসব উপলক্ষে সমাগত ভক্তবৃন্দের সংখ্যা হ্রাস হইতেও ইহা অনুমান করা চলে। এই মতের প্রভাব হ্রাস এবং দোল মেলায় যাত্রী সংখ্যার অবনতির কারণ একই। যে কোন ধর্মমত আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে বিশেষ সামাজিক অবস্থায়—এবং কোন মহাপুরুষের প্রভাবে তাহা প্রসার লাভ করে এবং তাঁহার তিরোধানের পরও অনেক দিন হয়তো সেই প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় থাকে। কিন্তু ক্রমেই তাহা মূল মতাদর্শ হইতে সরিয়া আসিতে থাকে এবং একদিন ইহার পতন ঘটে। কর্তাভজা সম্পর্কেও অনুরূপ পদ্ধতিতে ধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তির বিলুপ্তি ঘটিয়াছে। যে সামাজিক পটভূমিকায় ইহার উদ্ভব তাহা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। ধর্মের মূল আদর্শ এখন ভক্তভগবজ্জনেরাও ভুলিয়া গিয়াছে। ধর্মীয় বিশিষ্ট সাধনপদ্ধতি বিস্মৃত হইয়া অনেকেই কর্তাভজার নামে শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠানের গতানুগতিকতায় নিমগ্ন হইয়াছেন। তাহা ছাড়া প্রবর্তক ফকির ঠাকুর অথবা শিষ্য রামশরণ কিম্বা পরবর্তী দু'একজন কর্তা, রামদুলাল ইত্যাদির যে অলৌকিক সিদ্ধি ও সাধক সুলভ গুণাবলী ছিল পরবর্তী কর্তাদের মধ্যে তাহার কিছুই নাই। তাঁহারা নিতান্তই সংসারী মানুষ সুতরাং ভক্তদের মধ্যে নূতন করিয়া প্রেরণা সঞ্চার করিবার মত যোগ্যতাও তাঁহাদের নাই। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই এই ধর্মমতের প্রভাব বিলুপ্তির পথে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রবর্তক প্রচারক পরিচয়

বিভিন্ন গ্রন্থে কর্তাভজাদের সম্পর্কে খণ্ড বিচ্ছিন্ন কিছু কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকিলেও—ধারাহিক পূর্ণাঙ্গ বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না। এই ধর্ম সম্পর্কিত অনেক কথাই জনশ্রুতির মধ্যে নিহিত। সেই সমস্ত জনশ্রুতি সংগ্রহ করিয়া —তাহার মধ্য হইতে বিশ্বাসযোগ্য উপাদান গ্রহণ করিয়া এবং গবেষকেরা অন্য প্রসঙ্গে কর্তাভজাদের সম্পর্কে যে সমস্ত মন্তব্য করিয়াছেন তাহা হইতে যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ একখানি ইতিবৃত্ত রীতিমত অপেক্ষিত। বর্তমানে এ সম্পর্কে যতটুকু তথ্যাদি পাওয়া সম্ভব —ভবিষ্যতে তাহাও দুর্লভ হইবে। যাহা হউক এ সম্পর্কে গবেষকেরা তৎপর হইবেন ইহাই বাঞ্ছনীয়। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা কর্তাভজা-ধর্মের প্রবর্তক আউলচাঁদ ও ইহার প্রচারক আউলচাঁদের শিষ্যদের সম্পর্কে কিছু আলোচনা লিপিবদ্ধ করিব। নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবে পূর্ণাঙ্গ বিবরণ রচনা সম্ভব নহে। জনশ্রুতি ও বিভিন্ন গ্রন্থের উল্লেখাদি হইতে বর্ণনাকে যথাসম্ভব ধারাবাহিক করিবার চেষ্টা করিব।

কর্তাভজাদের সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থে যেখানে যতটুকু বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে অথবা যত জনশ্রুতি আছে সর্বত্রই একথা স্বীকার করা হইয়াছে যে আউলচাঁদ নামক জনৈক সাধকই এই ধর্মের প্রবর্তক। প্রায় সর্বত্রই তাঁহাকে ফকির বা ফকির ঠাকুর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ফকির বলিতে স্বভাবতই গৃহবিবাগী মুসলমান সাধককে বুঝায়। আউলচাঁদ নিজে মুসলমান ছিলেন অথবা হিন্দু হইয়া কোন মুসলমান ফকিরের শিষ্য ছিলেন সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। তবে প্রবর্তনের কাল হইতে এই ধর্মমতের সহিত যে ইসলামের কিছু কিছু সংযোগ ছিল সে কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। বস্তুত এই যোগাযোগের সামাজিক প্রয়োজন সে যুগে ছিল এবং হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতির প্রয়োজনেই ইহা ঘটিয়াছিল। যাহা হউক ফকির ঠাকুরের জীবনের যে সমস্ত তথ্যাদি অবগত হওয়া যায় বর্তমানে তাহার উল্লেখ করা হইতেছে।

আউলচাঁদ সম্পর্কে যে সমস্ত বিভিন্ন জনশ্রুতি প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে একটি বেশ দীর্ঘ এবং ধারাবাহিক। জন্মের পর প্রথম ৭-৮ বৎসর বাদে প্রায়

সমস্ত জীবনের কাহিনীই ইহাতে পাওয়া যায়। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন সঙ্গীতেও এই কাহিনীর সমর্থন পাওয়া যায়। তবে জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া সঙ্গীতগুলি রচিত হইয়াছিল কিনা বলা যায় না। সুতরাং কাহিনী ঐতিহাসিক ভাবে নির্ভুল কিনা তাহা বলা সম্ভব নয়। সমস্ত জনশ্রুতির ক্ষেত্রে যাহা ঘটে এখানেও সম্ভবত তাহাই ঘটিয়াছে—অর্থাৎ—মূলে অনেকখানি যেমন সত্য আছে—তেমনি ভক্তজনের উচ্ছ্বসিত আবেগে কাহিনী বহুলাংশে পল্লবিত ও অতিরঞ্জিত। যাহা হউক কাহিনীটি নিম্নরূপ :

নদীয়া জেলার অন্তর্গত উলাবীরনগর গ্রামে মহাদেব দাস নামক জনৈক ব্যক্তি বাস করিতেন। একটি পুকুর পাড়ে একদিকে আম্রকানন ও অন্যদিকে মনোহর পুষ্পোদ্যানের পাশে তাঁহার একটি পানের বরজ ছিল। ১১০১ বঙ্গাব্দে দোল পূর্ণিমার দিনে অতি প্রত্যুষে মহাদেব যথারীতি বরজে গিয়াছেন। অর্গলবদ্ধ বরজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেলেন। বরজের মধ্যে আনুমানিক অষ্টম বর্ষীয়, সৌম্যমূর্তি, ললাটে গৌরাঙ্গদেবের ন্যায় দিব্যভাতি, ছিন্নকন্থা পরিহিত একটি বালক। বালকটি কথা বলিতে পারে কিন্তু নিজের আত্মপরিচয় কিছু দিতে পারে না। কি করিয়াই বা সে বরজ মধ্যে প্রবেশ করিল তাহাও সে জানে না। নিঃসন্তান মহাদেব বালকটির রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে নিজের গৃহে লইয়া আসেন এবং মহাদেবের স্ত্রীও তাহাকে পুত্রবৎ লালন পালন করিতে থাকেন। বালকটির বদনে ছিল পূর্ণ চন্দ্রের দিব্যবিভা—স্বামী স্ত্রীতে বালকটির নাম রাখিলেন পূর্ণচন্দ্র।

পূর্ণচন্দ্র মহাদেবের বাড়িতে প্রাথমিক বাংলা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ঐ গ্রামবাসী হরিহর ঠাকুর নামক জনৈক বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণের নিকট হইতে সংস্কৃত ভাষা ও কিছু ধর্মপুস্তক অধ্যয়ন করেন। স্মৃতি ও ধীশক্তিতে পূর্ণচন্দ্র ছিলেন অসাধারণ এবং পুরাণ কোরাণ অনেক কিছুই তিনি পূর্ব হইতে জানিতেন।

বিদ্যাভ্যাস সমাপনান্তে পূর্ণচন্দ্র ফুলিয়া গ্রামে গিয়া বৈষ্ণব চূড়ামণি বলরাম দাসের নিকট হইতে বৈষ্ণব ধর্মমতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই সময়েই পূর্ণচন্দ্রের নাম হয় আউলচাঁদ বা আউলেচাঁদ। দীক্ষা গ্রহণের পর আউলচাঁদ বজরা গ্রামে আসিয়া কিছুকাল অবস্থিতি করেন। কথিত আছে ঐ সময়ে জগদীশপুরের নন্দরাম পাল মহাশয় নবাগত ঠাকুর আউলচাঁদের দর্শন মানসে বজরাতে আসেন এবং দর্শন লাভের পর পুত্র প্রাপ্তির বর প্রার্থনা করেন। ফকির ঠাকুর তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া নির্দেশ দেন যে পুত্র হইলে যেন তাহার নাম রাখা হয় 'রামশরণ'। এই আশীর্বাদ ফলপ্রসূ হয় এবং নন্দরামের পুত্রের নাম যথারীতি রামশরণই রাখা হয়। রামশরণের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে নন্দরাম ফকির ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে বজরা গ্রামে যাইয়া অবগত হন যে ফকির ঠাকুর দেশ

ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন এবং বর্তমানে কোথায় আছেন কেহ জানে না। নন্দরাম খুব কাতর হইয়া পড়েন এবং মনে মনে ঠাকুরের উপস্থিতির জন্য কামনা করিতে থাকেন। অত্যন্ত আকস্মিকভাবে অন্নপ্রাশনের দিন ফকির ঠাকুর উপস্থিত হইয়া নিজের সহিত আনীত প্রসাদ ও গঙ্গোদক শিশুকে প্রদান করেন ও সর্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া আশীর্বাদ করেন। অর্থাৎ শৈশব হইতেই রামশরণের মধ্যে তিনি নিজের বিভূতি সঞ্চার করিয়া দেন।

উক্ত ঘটনার পর আউলচাঁদ তাঁহার দীক্ষাগুরু বলরামের সহিত দেশ ভ্রমণ ও পর্যটনে বাহির হন। বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণের পর গুরু প্রত্যাবর্তন করেন এবং আউলচাঁদ একাই ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থস্থানগুলি দেখিয়া বেড়ান। দীর্ঘ দিন ভ্রমণ করিবার পর আউলচাঁদ হুগলি জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণীর ঘাট পার হইয়া ২৪ পরগণার অন্তর্গত হালিশহর, কাঁচড়াপাড়ার মধ্যদিয়া ঘোষপাড়াতে আসিয়া উপস্থিত হন। পথিমধ্যে কাঁচড়াপাড়ার কানাই ঘোষ নামক জনৈক সম্পদশালী ব্যক্তি ঠাকুরের সঙ্গ নেন এবং তাঁহাকে ঘোষপাড়া পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেন।

ইহার সামান্য কিছুকাল পূর্বে ঠাকুরের বরপুত্র রামশরণ জন্মভূমি জগদাশপুর ও পিতৃ সংসার পরিত্যাগ করিয়া সস্ত্রীক ঘোষপাড়ায় আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। এই সময় নূতন করিয়া সংসার স্থাপনের জন্য প্রভূত পরিশ্রম করিয়া রামশরণ রীতিমত পীড়িত হইয়া পড়েন। ঠিক এই উপযুক্ত মুহূর্তে ঠাকুরের আবির্ভাব ঘটে এবং তাঁহার আশীর্বাদে রামশরণ শীঘ্রই রোগমুক্ত হন। সুস্থ হইয়া রামশরণ সস্ত্রীক ঠাকুরের সেবায় ব্রতী হন। প্রীত হইয়া ঠাকুরও ক্রমে এখানেই স্থায়ীভাবে থাকিতে শুরু করেন।

রামশরণের রোগমুক্তির সংবাদ তথা ঠাকুরের অলৌকিক শক্তির কথা অচিরেই দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। রামশরণের গৃহে প্রতিদিন বহু সংখ্যক ভক্ত, সাধক, রোগী, প্রার্থী ইত্যাদি সমাগম ঘটিতে লাগিল। এই সময়ই ঠাকুর ক্রমে ক্রমে রামশরণ, কানাই ঘোষ ইত্যাদির বাইশজন শিষ্যকে দীক্ষা দান করেন। এই বাইশজনই ঠাকুরের আদি শিষ্য। এই সম্প্রদায়ের অন্যান্য ভাগবজন এই বাইশজনের শিষ্য প্রশিষ্য পরম্পরা। এই বাইশজন শিষ্যকে দীক্ষা দান উপলক্ষে ঠাকুর মাঝে মাঝে ঘোষপাড়া হইতে বাহির হইতেন। নচেৎ একরূপ স্থায়ীভাবেই ঘোষপাড়াতে বসবাস করিতেন।

ইহার পর ঠাকুরের জীবনে নূতন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা জানা যায় না। ঘোষপাড়ায় অবস্থান করিয়া সাধন পূজন এবং ভক্ত জনের মনোরথ পূরণেই তাঁহার দিন অতিবাহিত হইতে থাকে। ইতিমধ্যে বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে। ১১৭৬ বাংলা সনে (অর্থাৎ ১৭৬৯-৭০) ঠাকুরের নিকট সংবাদ

আসে যে বোয়ালিয়া গ্রাম নিবাসী ঠাকুরের অন্যতম ভক্ত বলরাম[১] কঠিন রোগে আক্রান্ত। ঠাকুর সেখানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হন এবং উপস্থিত ভক্ত শিষ্যগণকে জানান যে এই তাঁহার শেষ যাত্রা; তিনি আর বেশিদিন বাঁচিবেন না। বোয়ালিয়াতেই ভক্তসহ তাঁহার ইহলীলা সাঙ্গ হইবে। এই সময়েই ঠাকুরের ইচ্ছায় রামশরণ পাল ঠাকুরের প্রধান শিষ্য হিসাবে তাঁহার ঐশী শক্তির উত্তরাধিকারী হইয়া সম্প্রদায়ের মহন্ত (সম্প্রদায়ের নিজের ভাষায় 'কর্তাবাবা') নিযুক্ত হন এবং তাঁহার স্ত্রী সরস্বতী দেবী (সতী-মা) কর্তা-মা বলিয়া খ্যাত হন। বোয়ালিয়াতেই ঠাকুরের তিরোভাব ঘটে। ঠাকুরের শেষ স্মৃতিচিহ্ন এই বোয়ালিয়া গ্রামে এখনও আছে। সম্প্রদায়স্থ ভক্ত ভাগবজ্জনের ইহা একটি পুণ্যতীর্থ। প্রতি বৎসর, বিশেষ করিয়া দোলের সময় বহু সহস্র যাত্রী ঐ পুণ্য-তীর্থ দর্শন করেন এবং পূজা অর্চনা করিয়া শান্তি লাভ করেন।

যদিও পূর্ব বর্ণিত কাহিনীতে আউলচাঁদের গুরু হিসাবে জনৈক বলরামদাসের নাম করা হইয়াছে—তবুও তাঁহার গুরু যে কে তাহা নিশ্চিত করিয়া জানা যায় না। বিশেষত অউলচাদ বা আউলেচাঁদ নাম দেখিয়া অনেকেই মনে করেন আউল-চাঁদ নিজে অথবা তাঁহার গুরু মুসলমান ছিলেন কারণ আউলে বা আউল শব্দটি ফারসী শব্দ। সুফী সাধকদের উপাধিও আউলিয়া। ইহা ব্যতীত আউলচাঁদের সম্পর্কিত সব কাহিনীতেই তাঁহাকে ফকির বলিয়া এবং তাঁহার প্রথম আবির্ভাব মুসলমান ফকিরের মত কন্থাপরিহিত অবস্থায় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সমস্ত বিষয়ও আউলেচাঁদের স্বয়ং মুসলমান অথবা মুসলমান গুরুর শিষ্য হওয়ার অনুমান সমর্থন করে। অবশ্য অনেকে আউল শব্দটির উদ্ভব সংস্কৃত 'আকুল' শব্দ হইতে অনুমান করেন এবং সেই হিসাবে তাহারা আউলচাঁদের হিন্দু উদ্ভব কল্পনা করেন। এ বিষয়ে জোর করিয়া কিছু বলা দুরূহ।[২]

আউলচাঁদের জীবনী সম্পর্কে আরও নানা প্রকার কাহিনী প্রচলিত আছে। সবগুলি কাহিনীর শেষের দিকের অংশে ফকির ঠাকুর কর্তৃক বাংলাদেশের বিভিন্নস্থানে ঘুরিয়া বাইশ জন শিষ্যকে দীক্ষা দান এবং শেষ বয়সে রামশরণকে

১. ফকিরের শিষ্য তালিকায় বলরাম বলে কোন নাম নেই। ইতিপূর্বে বৈষ্ণব চূড়ামণি বলরাম দাসকে ফকিরের বৈষ্ণবগুরু বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে তাঁর নিবাস ছিল ফুলিয়ায়। এখানে বোয়ালিয়া গ্রাম নিবাসী বলরামের কথা বলা হচ্ছে। দুই বলরাম অভিন্ন একথা বলার মত কোন প্রমাণ নেই।

তবে ভক্তের অসুস্থতার জন্য প্রবাসযাত্রা অপেক্ষা গুরুর অসুস্থতার জন্য প্রবাসযাত্রা বেশি যুক্তিযুক্ত মনে হয়। যাইহোক শেষ জীবনে ফকিরের ঘোষপাড়া ত্যাগ এবং জনৈক পরিচয়হীন বলরামের নাম তার সঙ্গে যুক্ত করা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। বিস্তারিত আলোচনার জন্য গ্রন্থশেষে সংযোজন দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক

২. আমাদের ধারণা ইনি মূলত মুসলমান বা মুসলমান ফকিরের শিষ্য ছিলেন। বিস্তারিত আলোচনা গ্রন্থশেষে সংযোজনে দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক

কর্তাবাবা নিযুক্ত করার কথা পাওয়া যায়। আউলচাঁদ অষ্টমবর্ষীয় বালক ফকির হিসাবে প্রথম দর্শন দিয়াছিলেন—এই অংশটি সবগুলি কাহিনীতে পাওয়া যায় না। বরং প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় বরজের মধ্যেই প্রথমে মহাদেব বারুইকে দর্শন দিয়াছিলেন একথা অনেক কাহিনীতেই আছে। আবার কোন কোন কাহিনীতে মহাদেবের নাম নাই একেবারে রামশরণের সহিত সাক্ষাৎ হইতে কথা শুরু। Nadia District Gazetteer-এ উল্লিখিত কিম্বদন্তীগুলি রামশরণের সহিত সাক্ষাতের কাহিনী হইতে শুরু। সেখানে ফকির ঠাকুর সম্পর্কে দুইটি জনশ্রুতি লিপিবদ্ধ আছে। তাহার একটিতে অবগত হওয়া যায় যে রামশরণ জগদীশপুরে নিজের পিতামাতাকে ছাড়িয়া ঘোষপাড়ায় আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিবার পর গোবিন্দ ঘোষের কন্যাকে বিবাহ করেন। বিবাহের অল্প কিছু দিনের মধ্যেই জনৈক ফকির ঠাকুরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ফকির ঠাকুর তাঁহাকে বলেন যে এখানে আগমনের পথে তিনি নবাবের সৈন্যগণ কর্তৃক প্রহৃত হইয়াছেন এবং কোনও ক্রমে কৌশলে পলাইয়া আসিয়াছেন। ফকিরের হাতে একটি পাত্র ছিল এবং তাহা দেখাইয়া তিনি বলেন যে গঙ্গার জল ঐ পাত্রে প্রবেশ করাইয়া তিনি গঙ্গাকে শুকাইয়া শুষ্ক খাতের উপর দিয়া পলাইয়া আসিয়াছেন। রামশরণ ফকিরকে শান্ত করেন এবং তাঁহার বিদায়কালে পাত্রটি চাহিয়া লন। ঐ পাত্রটি এখনও রামশরণের অধস্তন পুরুষদিগের নিকট বর্তমান। District Gazetteer সম্পাদনকালে পাত্রটি বাবু (বর্তমানে স্বর্গীয়) গোপালকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের বাড়িতে ছিল। District Gazetteer-এ উল্লিখিত অন্য কিম্বদন্তীতে পাওয়া যায় যে রামশরণ একদা তাঁহার পশু চরাইতে ছিলেন; এমন সময় সহসা ফকির ঠাকুর সেখানে আবির্ভূত হন এবং এক বাটি দুধ প্রার্থনা করেন। হঠাৎ সংবাদ পাওয়া যায় যে রামশরণের স্ত্রী অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। ফকির ঠাকুর নিজে যাইয়া রামশরণের স্ত্রীকে সুস্থ করিবার প্রস্তাব করেন এবং নিকটস্থ একটি পুকুরের কাদা লইয়া তাহাকে নিরাময় করেন। অতঃপর ফকির ঠাকুর বলেন যে তিনি শীঘ্রই এই রমণীর গর্ভে সন্তানরূপে জন্ম গ্রহণ করিবেন এবং যথা সময়ে তিনি "রামদুলাল" রূপে ভূমিষ্ঠ হন। অনুরূপ আর একটি কাহিনীতে দেখা যায় জনৈক পাগল ফকির ছিন্নকন্থা পরিধান করিয়া দেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং যাহার সহিত দেখা হইত তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেন—"তুই কি আমার কাছে কিছু ধারিস"। পাগল মনে করিয়া স্বভাবতই সকলে নিরুত্তরে চলিয়া যাইত। কিন্তু রামশরণ, কি মনে করিয়া জানিনা, উত্তর করিল,—"বোধহয় কিছু ধারি।" ফকির বলিলেন, "তবে শোধ কর।" এইভাবে রামশরণ পালের সহিত ফকিরের প্রথম যোগাযোগ শুরু হইল এবং ফকির রামশরণের বাড়িতে গোপনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু ফকিরের গোপনীয়তা বেশিদিন রহিল না কারণ রামশরণের স্ত্রীর কঠিন অসুখ

নিরাময় করিবার জন্য ফকির যে অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা জানিতে পারিয়া দলে দলে গ্রামবাসী ফকিরের দর্শনপ্রার্থী হইলেন। ক্রমে ফকির প্রকাশ্যে দেখা দিয়া ধর্মের বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন।

ফকির ঠাকুরের সমাধি সম্পর্কিত কাহিনীতেও মতভেদ আছে। কথিত আছে—"মৃত্যুর পর শিষ্যদের মধ্যে দু-মত হয়েছিল গুরুর সমাধিব্যবস্থা নিয়ে। শেষে দু জায়গায় দুরকম সমাধি দিয়ে মীমাংসা হল। আউলচাঁদের কাঁথার সমাধি দেওয়া হল বোয়ালে গ্রামে, তার দেহ সমাহিত হল চাকদার কাছে পরারি গ্রামে।"[১] পরারি গ্রামেও সমাধি মন্দির আছে এবং সেখানেও প্রতি বৎসর বহু দর্শনার্থীর ভিড় হয়।

এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন কাহিনীর মধ্যে মূল কথা যে মোটামুটি একই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার জীবন কাহিনীর পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া না গেলেও তিনি যে একজন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ ছিলেন তাহা সর্ববাদীসম্মত। অনেক প্রাচীন গানে তাঁহার উল্লেখ আছে। "শ্রীশ্রীযুতের পদ" নামক কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সাধন সঙ্গীতে একটি গীতে আছে:

যে মানুষেতে আশা করে ত্রিজগতের লোকে
সেই মানুষ এসেছে এ মুলুকে ভাই দেখরে সম্মুখে,
আর অন্যমত করোনা কেহ কার সনে,
মানুষের শরণাগত যেখানে,
কি হবে কি হবে ভাবনা,
যা চাবে তা দেবে লবে আর ভেবনা
আর নিশিভাগে শশী আগে জাগিতে না জাগিতে।[২]

আর একটি পুরাণো গানেও আছে:

এ ভাবের মানুষ কোথা হতে এলো,
এর নাইক রোষ সদাই তোষ, মুখে বলে সত্য বল,
এর সঙ্গে বাইশজন সবার একটি মন,
জয় কর্তা বলে বাহু তুলে কল্লে প্রেমে ঢল ঢল,
এর ছেড়া কন্থা গায় উনবিংশ চিহ্ন পায়
এ হারা দেওয়ায় মরা জীয়ায় এর হুকুমে গঙ্গা শুকালো।[৩]

---

১. কর্তাভজার কথা ও গান। ডঃ সুকুমার সেন। বিশ্বভারতী পত্রিকা। ১০ম বর্ষ ১ম সংখ্যা।

২. শ্রীযুতের পদ. দ্বিতীয় ভাগ পৃঃ ১৬৯; ডাঃ ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় V. L. M. S. F. T. S. কর্তৃক প্রকাশিত। [মনুলাল মিশ্র প্রকাশিত ভাবের গীত, পৃঃ ৯৪—সম্পাদক]

৩. প্রাগুক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত। দ্র. ভূমিকা পৃঃ ৭।

প্রত্যেক ধর্মগুরুর জীবনকাহিনী অবলম্বন করিয়া ভক্ত জনসাধারণের মধ্যে অনেক জনশ্রুতি প্রচলিত থাকে এবং সত্য মিথ্যায় মিশানো অনেক কাহিনী পল্লবিত হয়। আউলচাঁদের সম্পর্কেও যে তাহা হইয়াছে তাহাতেই প্রমাণিত হয় যে তৎকালীন দেশবাসীরা আউলেচাঁদকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। তাই তাঁহার সম্পর্কে নানা কাহিনী রচনা করিয়া প্রচার করিয়াছিল। ভক্তের বিশ্বাসে আদিগুরুর চিত্র যে কিছু অতিরঞ্জিত রূপ ধারণ করিবে তাহাও স্বাভাবিক। এই সম্প্রদায়ের ভক্তজনের দৃষ্টিতে আউলচাঁদ গৌরাঙ্গ দেবের অবতার। গৌরাঙ্গদেব রাধা এবং কৃষ্ণের যুগলরূপের অবতার আর আউলচাঁদ গৌরাঙ্গদেবের অবতার সুতরাং সেই হিসাবে অনু-অবতার। গীতায় আছে যুগে যুগে অধর্মের গ্লানি দূর করিয়া, দুষ্কৃত বিনাশ করিয়া, ধর্ম সংস্থাপনের জন্য ভগবান ধরাধামে অবতীর্ণ হন :

যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৪।৭
পরিত্রাণায় সাধুনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৪.৮

শ্রীকৃষ্ণের এই বিখ্যাত উক্তি স্মরণ করিয়া চিরকাল ভক্তজন নবধর্ম প্রচারককে অবতার হিসাবে মানিয়া আসিয়াছেন। সেই হিসাবে আউলচাঁদও ভক্তের চক্ষে, গৌরাঙ্গের অবতার হিসাবে গণ্য।

আউলচাঁদকে গৌরাঙ্গের অবতার হিসাবে বর্ণনার মধ্যে অবশ্যই ভক্তজনের বিশ্বাসের উপাদান অনেকখানি ক্রিয়া করিয়াছে। কিন্তু সাথে সাথে এই ধর্মমত প্রবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার একটি ইঙ্গিতও ইহার মধ্যে নিহিত আছে। চৈতন্য চরিতামৃতে অন্ত্যলীলায় পাওয়া যায় অদ্বৈতাচার্য জগদানন্দ পণ্ডিতের মারফৎ চৈতন্যদেবকে একটি প্রহেলিকাপূর্ণ সংবাদ পাঠাইয়া ছিলেন :

বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল।—ইত্যাদি

অন্যান্য বাউলদের মত কর্তাভজা সম্প্রদায়ও এই প্রহেলিকাটির তাৎপর্য নিজেদের অনুকূলে গ্রহণ করিয়া এইভাবে ব্যাখ্যা করে যে বর্তমানে দেশের মধ্যে চৈতন্য প্রবর্তিত প্রেমধর্ম আর চলিতেছে না। সুতরাং নূতন প্রেরণার প্রয়োজন। হাটে চাউল বিকায় না ইহার অর্থ—প্রেমধর্মের কদর নাই। আউল বাউল ইত্যাদি সম্প্রদায় মনে করেন যে উক্ত প্রহেলিকাটির অর্থ চৈতন্যদেবকে নূতনভাবে অবতীর্ণ হইবার আহ্বান। এই প্রহেলিকাপূর্ণ সংবাদ অবগত হইয়া

চৈতন্যদেব অপ্রকট হন (৯৩৯ সালে) এবং প্রায় দেড় শত বৎসর পর আউলচাঁদরূপে আবির্ভূত হন। (১১০১ সাল)

অদ্যাপিও সেই লীলা করে গোরা রায়।
মধ্যে মধ্যে ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

বৈষ্ণবভাবাপন্ন ফকির হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের নিকট গ্রহণযোগ্য যে সহজধর্ম প্রচার করিলেন তাহা যে ভুঁই-ফোঁড় ধর্ম নহে, তাহার একটি ধারাবাহিকতা আছে, এই দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য চৈতন্যদেবের সহিত আউলচাঁদকে যুক্ত করা হইয়াছে। সে যাহাই হউক আউলচাঁদের ধর্মমতের সহিত চৈতন্যপ্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের যে যোগ ছিল একথা ঐতিহাসিক-ভাবে সত্য। আউলচাঁদকে চৈতন্যদেবের অবতার বলায় সেই যোগটি পরিস্ফুট হইয়াছে।[১]

দুই

ঘোষপাড়ার কর্তাভজা ধর্ম আউলচাঁদ কর্তৃক প্রবর্তিত হইলেও জনসাধারণের মধ্যে ইহার প্রচার সম্ভব হইয়াছিল, তাঁহার শিষ্যগণ, বিশেষ করিয়া রামশরণ পাল এবং তাঁহার বংশধরগণ কর্তৃক। যদিও রামশরণ পাল আউলচাঁদ কর্তৃক কর্তাবাবা নিযুক্ত হন[২] তবুও বাইশজন শিষ্যের প্রত্যেকেই 'মহাশয়' অর্থাৎ গুরু হিসাবে পরিগণিত ছিলেন এবং প্রত্যেকেরই 'বরাতি'কে দীক্ষাদানের অধিকার ছিল। আউলচাঁদের বাইশজন শিষ্য যে কে কে ছিলেন তাহাও একেবারে নিশ্চিত করিয়া জানা যায় না। তবে প্রাচীন গান, বিভিন্ন জনশ্রুতি ইত্যাদি প্রতি ক্ষেত্রেই শিষ্য সংখ্যা যে বাইশজন ছিল এ বিষয়ে ঐকমত্য দেখা যায়। একটি গানে আছে "আউলচাঁদ দোয়া গরু সঙ্গে বাইশ বাছুর তায়।" আর একটি গানে আছে :

১. বাংলার সহজিয়াবৈষ্ণব, বাউল, কর্তাভজা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈষ্ণবসাধনার নাড়ীর যোগ অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু কর্তাভজাদের আলোচনা প্রসঙ্গে ড. উমা রায় গৌরনাগরীভাবের সাধনাকে এর উৎস বলে বর্ণনা করেছেন। দ্রঃ 'কর্তাভজা ও কিশোরী ভজা'—প্রবন্ধ; বেতার জগৎ ৪৩ বর্ষ, ২২ সংখ্যা। লেখিকা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন নি। কর্তাভজাদের কোনো গীতে ভক্ত সাধক নিজেকে 'অবলা সরলা' বা 'কুলবতী রমনী' বলে জলধি পার হবার জন্যে কাণ্ডারী শ্রীহরিকে আহ্বান জানিয়েছে কদাচিৎ—একথা ঠিক। কিন্তু এ পুরোপুরি গৌরনাগরীভাবের সাধনা নয়, এবং কর্তাভজা গৌরনাগরীভাবের দ্বারা প্রভাবিত এ ধারণাও ঠিক নয়।—সম্পাদক

২. কোনো কোনো জনশ্রুতিতে এমন কথা প্রচলিত থাকলেও এ বিষয়ে যে মতভেদ আছে তা স্বীকার্য।—সম্পাদক

ও কে বাইশ ফকির মাঝে কাঙ্গাল বিরাজে
কাঙ্গালে করিতে দয়া কাঙ্গাল সাজ সাজে ॥

এইরূপ উল্লেখ বহুক্ষেত্রেই আছে।

আউলচাঁদের বাইশজন শিষ্যের নামের যে তালিকা পাওয়া যায় তাহার মধ্যে মোটামুটি মিল থাকিলেও—দুই একটি ক্ষেত্রে কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ডঃ ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীযুতের পদ' নামক গ্রন্থের 'মুখবন্ধন' নামক 'কর্তাভজা ধর্মের কিঞ্চিৎ আদি ইতিহাস সংগ্রহ' অংশে, ডঃ সুকুমার সেন লিখিত 'কর্তাভজাদের কথা ও গান, নামক প্রবন্ধে (বিশ্বভারতী পত্রিকা ১০ বর্ষ ৩য় সংখ্যা), শ্রীহারাধন মুখোপাধ্যায় রচিত 'সত্যস্রোত' নামক গ্রন্থে এবং অন্যান্য বিবিধ স্থানে এই শিষ্যগণের নামের তালিকা লিপিবদ্ধ আছে।

শ্রীশ্রীযুতের পদের মুখবন্ধনের তালিকা নিম্নরূপ :—

১। হটু ঘোষ ২। শঙ্কর বাগ ৩। শ্যাম কাঁসারি ৪। বিষ্ণু বা বিশুদাস ৫। বেচু ঘোষ ৬। জগদীশপুর নিবাসী রামশরণ পাল ৭। নিত্যানন্দ দাস ৮। মনোহর দাস ৯। পাঁচকড়ি রুইদাস বা পাঁচু ১০। কানাই ঘোষ ১১। আনন্দরাম ১২। ভীমরায় রাজপুত ১৩। নিতাই ঘোষ ১৪। হরি ঘোষ ১৫। নয়ান ১৬। লক্ষ্মীকান্ত দাস ঘোষ ১৭। জগড়ার বড় রামনাথ দাস ১৮। দেদোকৃষ্ণ ১৯। নিধিরাম ঘোষ ২০। শিশুরাম ২১। কিনু গোবিন্দ ২২। গোদাকৃষ্ণ।

ডঃ সুকুমার সেন প্রদত্ত তালিকা নিম্নরূপ :

হটু ঘোষ, শঙ্কর, শ্যাম কাঁসারী, বিষ্ণুদাস, বেচু ঘোষ, রামশরণ পাল, নিত্যানন্দ দাস, মনোহর দাস, পাঁচকড়ি বা পাঁচু রুইদাস, কানাই ঘোষ, আন্দিরাম, বা আনন্দরাম, ভীমরায় রাজপুত, নিতাই ঘোষ, হরি ঘোষ, নয়ান দাস, লক্ষ্মীকান্ত, কৃষ্ণদাস, প্যালারাম বা খেলারাম, শিশুরাম, কিনু, গোবিন্দ (মতান্তরে কিনু গোবিন্দ ও রামনাথ।[১]

সত্যস্রোত গ্রন্থের তালিকা :

হটু ঘোষ, শঙ্কর, শ্যাম, বিশুদাস, বেচু ঘোষ, রামশরণ পাল, কিনু, মনোহর, পাঁচকড়ি, কানাই ঘোষ, আন্দিরাম, ভীমরায়, নিতাই, হরি, নয়ান, লক্ষ্মীকান্ত, বড় রামনাথ, দেদোকৃষ্ণ, নিধিরাম, শিশুরাম, কিনু গোবিন্দ, গোদাকৃষ্ণ।

তালিকাগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে—প্রথম তালিকায় ৭ নং বাদে ১—১৭ নং নাম এবং ২০ নং নাম প্রত্যেক তালিকাতেই উপস্থিত। প্রথম

১. ডঃ সুকুমার সেন ভারতকোষ ২য় খণ্ডে কর্তাভজা প্রসঙ্গ আলোচনায় যে শিষ্য তালিকার উল্লেখ করেছেন তা বর্তমান তালিকা থেকে সামান্য স্বতন্ত্র। দ্র. ভারতকোষ ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৭ —সম্পাদক

তালিকায় ৭নং নিত্যানন্দ দ্বিতীয় তালিকাতে পাওয়া গেলেও তৃতীয় তালিকাতে অনুপস্থিত। প্রথম তালিকার ১৭ নং বড় রামনাথ দাস সম্পর্কেও দেখা যায় দ্বিতীয় তালিকাতে এটি মতান্তরে বলিয়া বন্ধনীভুক্ত করিয়া লিখিত। অবশ্য এটিকে স্বতন্ত্র নাম হিসাবে না ধরিলে ডঃ সুকুমার সেনের প্রদত্ত তালিকায় নাম হয় ২১টি মাত্র। প্রথম তালিকার দেদোকৃষ্ণ (১৮) এবং গোদাকৃষ্ণ (২১) এই দুই নাম স্থলে দ্বিতীয় তালিকায় কৃষ্ণদাস নামে একজন শিষ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথম তালিকার নিধিরাম (১৯) দ্বিতীয় তালিকাতে প্যালারাম বা খেলারাম রূপে উল্লিখিত। অবশ্য ইহারা একই ব্যক্তি কিনা জানা যায় না। প্রথম তালিকায় কিনু গোবিন্দ (২১) বস্তুত কিনু ও গোবিন্দ এই দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তির নাম কিনা জানা যায় না। কিনু স্বতন্ত্র নাম হিসাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালিকাতে উল্লিখিত আছে। তৃতীয় তালিকাতে কিনু ও কিনু গোবিন্দ দুই নামই আছে। দ্বিতীয় তালিকাতে কিনু ও গোবিন্দ (মতান্তরে কিনু গোবিন্দ ও রামনাথের) উল্লেখ পাওয়া যায়। জনৈক ভক্তের স্বহস্ত লিখিত একখানি প্রাচীন অমুদ্রিত গ্রন্থে বেশ কয়টি নূতন নাম পাওয়া যায়:—১। কটা রামশরণ মল্লিক ২। এতবারি বিশ্বাস ৩। ভীমরাম বিশ্বাস ৪। শিবনাথ বিশ্বাস ৫। খেপা আন্দিরাম সরকার ৬। পাঁচকড়ি ঘোষ ৭। জুগন হালদার ৮। রামনাথ মণ্ডল ৯। তোতারাম। লক্ষণীয় বিষয় এই নামগুলির মধ্যে একটি মুসলমান নাম রহিয়াছে। প্রথম তালিকার ভীমরায় রাজপুত (১২) এবং শিশুরাম (২০) যথাক্রমে সদ্যোক্ত নামগুলির ভীমরায় বিশ্বাস এবং তোতারাম কিনা বলিবার উপায় নাই। তবে প্রথম তালিকার পাঁচু রুইদাস (৯) ও শেষোক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ একই ব্যক্তি না হইবার সম্ভাবনা কারণ ইহাদের পদবীর পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ। এই হস্ত লিখিত গ্রন্থখানির তালিকা হইতে জানা যায় যে নয়ান এবং লক্ষ্মীকান্ত জমজভ্রাতা—কিন্তু সেখানে পদবী দাস নহে দত্ত। এই গ্রন্থখানি হইতে ইহাও জানা যায় যে এ বিষ্ণুদাসের অপর নাম ছোট রামনাথ; সম্ভবতঃ সেইজন্যই অন্য রামনাথ বড় রামনাথ বলিয়া উল্লিখিত। যাহা হউক সর্বাপেক্ষা কৌতুককর বিষয় এই যে এই গ্রন্থে শিষ্য তালিকায় কটা রামশরণ মল্লিক বলিয়া একটি নামের উল্লেখ থাকিলেও—রামশরণ পালের নাম নাই। ইহার কারণ মনে হয় অনেক ভক্তের ধারণা রামশরণ পাল ও ফকির ঠাকুর একআত্মা এবং রামশরণ পালই কর্তাবাবা,—শিষ্য নহেন। এরূপ একটি ছন্দোগাঁথা শিষ্য নামমালার উল্লেখ করিয়াছেন ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বাংলার বাউল বাংলা গান নামক গ্রন্থে। এখানেও রামশরণের নাম নাই। কবিতাটি নিম্নরূপ:

শুন সবে ভক্তিভাবে নামমালা কথা।
বাইশ ফকিরের নাম ছন্দে যে গাঁথা॥

জগদীশপুর বাসী বেচু ঘোষ নাম।
শিশুরাম কানাই নিতাই নিধিরাম॥
ছোট ভীমরায় বড রামনাথ দাস।
দেদোকৃষ্ণ গোদাকৃষ্ণ মনোহর দাস॥

খেলারাম ভোলানাড়া কিনু ব্রহ্ম হরি।
আন্দিরাম নিত্যানন্দ বিষ্ণু পাঁচকড়ি॥
হটু ঘোষ গোবিন্দ নয়ান লক্ষ্মীকান্ত।
ইহারাই ভক্তি প্রেমে অতিশয় শান্ত॥
পূর্বের অনুসঙ্গী এই বাইশ জন।
এরাই করিল আসি হাটের পত্তন॥

বস্তুত 'হাটের পত্তনে' রামশরণের কৃতিত্ব সর্বাপেক্ষা বেশি হইলেও এই কবিতাটিতে পূর্বোক্ত একই কারণে রামশরণের নাম নাই। রামশরণ ও ফকির ঠাকুর যে একাত্ম সেই ধারণা সম্পর্কিত নিম্নোক্ত কবিতাটিও লক্ষণীয়:

ওগো তোরা বলগো আউলেচাঁদের কথা শুনতে চাই,
তাই সুধাই, আমাদের আউলে বই আর গতি নাই,
মহাদেব বারুয়ের ঘরে প্রভু প্রকাশ হল যে প্রকারে
বাইশ ফকিরের সাথে মিলে ছিলেন গোঁসাই,
উপেক্ষা করিয়া ডিঙ্গা হুকুমে শুকালো গঙ্গা,
জগদীশপুরেতে গিয়া পেয়েছিলেন ব্রজের রাই,
ব্রজপুরে হলো যোগ ঘুচে গেল ভবরোগ,
মেরা নাম রামশরণ পাল জানাইলেন এক আত্মাই……ইত্যাদি।[১]

আউলচাঁদ প্রবর্তিত ধর্মমত প্রচারে বাইশ জন শিষ্যের দান সামান্য নহে। কিন্তু কে যে কোন অঞ্চলে শিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সহজধর্ম প্রচার করেন—

---

১. শ্রীশ্রীযুতের পদ 'মুখবন্ধ', পৃঃ ৭।

কোনো কোনো গীতে শিষ্য তালিকায় রামশরণের নাম বাদ পড়লেও রামশরণ প্রথম থেকেই ফকিরের বাইশ শিষ্যের অন্যতম। যাঁরাই শিষ্যনামের তালিকা মুদ্রিত করেছেন তাঁরাই রামশরণের নাম করেছেন। বর্তমান গ্রন্থে মুদ্রিত তালিকাগুলি ছাড়া, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, নদীয়া কাহিনী, ভাবের গীত প্রভৃতিতে শিষ্য তালিকা মুদ্রিত আছে। সর্বত্র যে নামগুলি পাওয়া যায় তা হল বর্তমান গ্রন্থে মুদ্রিত শ্রীশ্রীযুতের পদের মুখবন্ধনের তালিকাধৃত ১ থেকে ৬, ৮ থেকে ১৬, এবং ২০ ও ২১ সংখ্যক নাম। ৭, ১৭, ১৮, ১৯, এবং ২২ সংখ্যক নামগুলি সম্পর্কে কিছু মতভেদ দেখা যায়। যাইহোক রামশরণকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া, মনে হয়, তাঁকে আউলচাঁদের সঙ্গে একাত্ম বা অভিন্ন বলে প্রচার করে তাঁর মহাত্ম্য বৃদ্ধির সচেতন প্রয়াস।—সম্পাদক

এবং তাঁহাদের নিজেদের জীবন কথাই বা কিরূপ তাহা জানিবার বিশেষ কোন উপায় নাই। কথিত আছে এই বাইশ ফকিরের কুড়িজনই ছিলেন গৃহত্যাগী। বাকী দুইজন ছিলেন গৃহী। এই গৃহবিবাগী সন্ন্যাসীরা স্বভাবতই পার্থিব ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন এবং তাঁহাদের শিষ্য সম্প্রদায়ও নিম্নশ্রেণীর সাধারণ মানুষ ছিলেন। তাই কেহ আর এই সন্ন্যাসীদিগের জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করে নাই। গৃহী শিষ্য দুই জনের জীবন কাহিনীর কিছু কিছু উপাদান এখনও পাওয়া যায়। ইহাদের নাম যথাক্রমে—রামশরণ পাল ও কানাই ঘোষ।

তিন

(ক) রামশরণ পাল

কর্তাভজা ধর্মের মূলবাণী ও প্রেরণা ফকির ঠাকুরের নিকট হইতে পাওয়া গেলেও রামশরণ পালই যে এই ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন একথা সর্ববাদীসম্মত। [উইলসন সাহেব ভ্রমক্রমে রামশরণ স্থলে রামসুন্দর লিখিয়াছেন।][1] পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে এই রামশরণ ছিলেন বাইশজন শিষ্যের অন্যতম প্রধান। ইহার জীবনী সম্পর্কেও খুব নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। যতটুকু পাওয়া যায় তাহাতে অবগত হওয়া যায় যে রামশরণের পিতার নাম ছিল নন্দরাম পাল, জাতি সদগোপ, পেশা চাষবাষ এবং নিবাস ছিল জগদীশপুর। মনে হয় বঙ্গাব্দ ১১২৫ হইতে ১১৫০ এর মধ্যে কোন সময়ে রামশরণের জন্ম হয়।[2] জন্মাবধি ইনি সংসারবিবাগী ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। একটি জনশ্রুতি মতে রামশরণের জন্মই হয় ফকির ঠাকুরের বরে এবং বাল্যকাল হইতে তিনি ছিলেন ফকিরের সহিত একাত্ম। ভক্তের চক্ষে ইনি ছিলেন ফকির ঠাকুরের সিদ্ধি ও বিভূতির বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারী। অন্য একটি কাহিনী মতে রামশরণ বাল্যকাল হইতে

১. বর্তমানে প্রচলিত সংস্করণে রামশরণই আছে।

উইলসনের মূল প্রবন্ধ 'Sketch of the Religious Sects of the Hindus' Asiatice Researches-এ ১৮২৮ ও ১৮৩২-এ প্রকাশিত। ১৮৪৬-এ মূলের যথাস্থিত reprint প্রকাশিত হয় কলিকাতা বিশপস কলেজ প্রেস থেকে। গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৬১-তে। প্রথম সংস্করণ সংকলন ও সম্পাদনা করেন E. R. Rost। তিনি মূলের কিছু কিছু বানান সংস্কার করেন। অধুনা প্রচলিত ২য় সংস্করণ প্রথম সংস্করণের পুনরমুদ্রণ। এখন গ্রন্থে রামশরণই আছে। রামসুন্দর স্থলে রামশরণ সংশোধন সম্ভবত প্রথম সংস্করণের সম্পাদককৃত।—সম্পাদক

২. খুব সম্ভব ১১৩০ বঙ্গাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে।—সম্পাদক

সংসারবিরাগী ছিলেন বলিয়া পিতৃসংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ঘোষপাড়ায় আসিয়া বাস স্থাপন করেন। এই সময়ে জশড়া নিবাসী গোবিন্দ ঘোষের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই ঘোষপাড়াতেই ফকিরের সহিত তাঁহার মিলন হয়। ফকির তাঁহাকে অথবা তাঁহার স্ত্রীকে রোগমুক্ত করেন এবং এই পরিবারেই বসবাস করিতে থাকেন। ফকির ঠাকুরই শেষ বয়সে রামশরণকে তাহার শিষ্যগণের প্রধান (মহন্ত) নির্বাচিত করিয়া যান—এবং পরে তিনি সম্প্রদায়ের পূজ্য 'কর্তাবাবা' রূপে পরিগণিত হন।

রামশরণ ছিলেন নিরীহ,ধর্মপ্রাণ, চাষী মানুষ। শুধু এইটুকু ছাড়া রামশরণের চরিত্রের আর কোন বিবরণই জানা যায় না। তিনি যে কিভাবে সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন এবং মত প্রচার করেন তাহার কোন বিবরণই পাওয়া যায় না। তবে এই সম্প্রদায়ের পুণ্য পীঠস্থান হিসাবে ঘোষপাড়ার প্রতিষ্ঠা যে ইহারই কৃতিত্ব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ফকির ঠাকুরের মত ইনিও নারীর বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণ, রোগ নিরাময় ইত্যাদি বিবিধ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সমসাময়িক কালে দিকপাল ধর্মাচার্য হিসাবে যে ইহার স্বীকৃতি ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় জয়নারায়ণ কৃত বাংলার বৃহত্তম কৃষ্ণলীলা কাব্যে :

পশ্চিমেতে ইচ্ছামনি উত্তরে কবির গুণী
পূর্বদিকে শ্রীরামশরণ
দক্ষিণে বল্লভ নামে মনোরম গুণধামে
মোর তত্ত্ব করিয়া বাখানে।···পৃ: ২৯৪
... .
উত্তরেতে লামা গুরু নানক দক্ষিণে
রামশরণ নাম এক হবে পূর্বধামে।
পুত্ররূপী অবতার হইবে পশ্চিমে
ইযুক্রাইষ্ট নাম তার রাখিবেক জনে। ইত্যাদি। পৃঃ ৩৫০

নবীনচন্দ্র সেনও আমার 'জীবন'-এ লিখিয়াছেন :

"যে রামশরণ পাল এই বেদ বেদান্ত প্লাবিত দেশে এরূপ একটা নূতন ধর্ম প্রচার করিয়া এত লোকের পূজার্হ হইয়াছিলেন তিনি কিন্তু সামান্য মানুষ ছিলেন না।······এখন যে সর্বধর্ম মতের সমন্বয় বলিয়া একটা কথা শুনিতেছি··· তাহা রামশরণ পালই প্রথম অনুভব ও প্রচার করিয়াছিলেন।"[১]

১. বিভিন্ন সূত্র থেকে অনুমান হয় রামশরণের তিরোভাব ঘটেছিল ১১৮৯ বঙ্গাব্দে —সম্পাদক

(খ) সতী-মা

আউলচাঁদ প্রবর্তিত ধর্মমত প্রচারে রামশরণের স্ত্রী সরস্বতী দেবীর (সতী-মা) অবদানও নিতান্ত কম নহে। সাধারণ ভক্তের মধ্যে কর্তাবাবা অপেক্ষা কর্তামায়ের প্রতিষ্ঠাই অধিক—এবং তিনিই এই সম্প্রদায়ের আরাধ্যা দেবী। জীবনী বলিতে যাহা বুঝায়—ইহার সম্পর্কেও তাহা রচনা করা দুরূহ। কেবলমাত্র এইটুকু অবগত হওয়া যায় যে ইহার পিতার নাম ছিল—গোবিন্দ ঘোষ।[১] ইনি শিক্ষিত ছিলেন কিনা অথবা কি ধরণের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন কিছুই জানা যায় না। তবে ইনি যে অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী সিদ্ধিমতী রমণী ছিলেন সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। কথিত আছে সতী-মা পাগলা ফকির ঠাকুরকে সন্তানবৎ স্নেহে লালন পালন করিতেন। একদিন তিনি ঠাকুরের মত একটি সন্তান কামনা করিয়া তাঁহার নিকট বর প্রার্থনা করেন। ফকির ঠাকুর তাহাকে জানান যে তিনি নিজেই তাঁহার কোলে সন্তানরূপে ফিরিয়া আসিবেন। ফকির ঠাকুরের তিরোধানের ছয় বৎসর পর সতী-মা দুলালচাঁদ নামক পুত্র লাভ করেন। সতী-মা অত্যন্ত দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন বলিয়াও জানা যায়। স্বামী রামশরণের মৃত্যুর পর তিনি ঘোষপাড়া পীঠ পরিচালনা করিতেন—অর্থাৎ সম্প্রদায়ের ভাষায় ইনিই 'গদীতে' বসেন।[২] তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার নির্দেশ মত বাড়ির একাংশে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। পরে সেখানে সমাধি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ভক্তগণের অন্যতম পূজার স্থান হিসাবে আজও তাহা পরিগণিত হইয়া থাকে। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের জনপ্রিয়তা এবং পীঠস্থান হিসাবে ঘোষপাড়ার মাহাত্ম্য প্রচারের মূলে সতী-মা'র অলৌকিক ঐশ্বর্যের প্রভাব যে বিশেষভাবে কার্যকরী হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কর্তাভজা ধর্মের বাণী ও সাধনপদ্ধতির কথা আজ হয়তো অনেকেই ভুলিয়া গিয়াছে কিন্তু সতীমার মাহাত্ম্য সম্পর্কে জনশ্রুতি এখনও কম প্রবল নহে। ১৩৬৮ সালের ১৬ই বৈশাখ দেশ পত্রিকায় নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"আউলচাঁদের আশীর্বাদে ও আপন সাধন বলে সতী-মা অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী হন। তিনি বাকসিদ্ধা ছিলেন। ভক্তের মনস্কামনা তাঁর বরে পূর্ণ হতো। তাঁর স্পর্শে রুগ্ন হত সবল, খঞ্জ হত সচল। অন্ধ পেত দৃষ্টি, মূক

১. সরস্বতী দেবীর জন্ম আনুমানিক ১১৬৫-৬৬ বঙ্গাব্দে এবং তিরোধান ১২৪৬ বঙ্গাব্দে। ইনি রামশরণের দ্বিতীয়া স্ত্রী। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর রামশরণ একে বিবাহ করেন।—সম্পাদক

২. নদীয়া কাহিনী ও নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার মতে রামশরণের মৃত্যুর পর পুত্র রামদুলাল কর্তা হন। রামদুলালের মৃত্যু সরস্বতী দেবীর জীবৎকালের মধ্যেই ঘটেছিল। রামদুলালের মৃত্যুর পর সরস্বতী দেবী গদিতে বসেন। আক্ষরিক অর্থে এ মন্তব্য মিথ্যা নাও হতে পারে। কিন্তু রামশরণের মৃত্যুকালে রামদুলাল ছিলেন সাত বছরের বালক মাত্র। সুতরাং রামশরণের মৃত্যুর পরই যে সতীমা গদিতে বসেন—এটাই প্রকৃত তথ্য।—সম্পাদক

বধির লাভ করতো বাক্ ও শ্রবণ শক্তি, বন্ধ্যা মৃতবৎসার কোলে আসতো সুলক্ষণ যুক্ত সন্তান।·········

······এ প্রায় পৌনে দুইশত বৎসর আগেকার কথা। সতীমার অসীম শক্তি ও অপার করুণার প্রতি ভক্তগণের বিশ্বাস আজও অক্ষয় হয়ে আছে।··· ·····"

ভক্তগণের বিশ্বাস যাহাই হউক—এত দীর্ঘদিন ধরিয়া শুধু অজ্ঞ নিরক্ষর নয়, শিক্ষিত ভক্তের মনেও বিশ্বাসের আসন অবিচল আছে বলিয়া ইহা অনুমান করিতে অসুবিধা হয় না—যে ইনি নিতান্ত সামান্য রমণী ছিলেন না।[১]

(গ) দুলাল চাঁদ [বা রামদুলাল]

ঠিক আক্ষরিক অর্থে না হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলিতে দুলালচাঁদকেই বোঝায়। ইনিই এই মতকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া, সঙ্গীত রচনা করিয়া ইহাকে জনপ্রিয় করিয়া তোলেন। খুব সম্ভব ১১৮২ বঙ্গাব্দে ইহার জন্ম হয়—এবং তিরোভাব ঘটে ১২৩৯ বঙ্গাব্দে। সাত বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয় এবং মাতার তত্ত্বাবধানে তাঁহার শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদি পরিচালিত হয়। ইনি বেশ শিক্ষিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়—এবং বাংলা ও সংস্কৃতের সাথে ফার্সী ও ইংরাজীও কিছু কিছু জানিতেন। Nadia District Gazetteer-এ ইহার সম্পর্কে লেখা আছে :

Ramsaran Pal is believed to have died in the year 1783 and his place as head of the sect was taken by his son Ram Dulal or Dulal Chand[২] He appears to have been a man of marked personality and considerable power of proselytism. He impressed a number of leading men of his time with his teaching and had added very largely to the numbers of sect by the time of his death, which took place in 1833. [P. 48]

বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী সাধক মহাপুরুষ দুলালচাঁদ সে যুগের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিকে নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে—পুণ্য পীঠস্থান হিসাবে ঘোষপাড়াকেও তিনি রীতিমত জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ভূকৈলাসের রাজাও এই ধর্মের তত্ত্বাদি অবগত হইবার জন্য এবং সম্ভবত দীক্ষা গ্রহণ প্রস্তাবে দুলালচাঁদের নিকট পত্র লেখেন। দুলালচাঁদ উত্তরে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইল :

১. এখনও প্রতি বছর দোলযাত্রায় কর্তাভজাদের যে মেলা-উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তা সাধারণ্যে 'সতী-মার মেলা' নামেই পরিচিত।—সম্পাদক

২. পৃ. ৩২ ২নং পা. টি. দ্র.

যদি ইচ্ছা থাকে বীজ করিতে রোপন,
উচিত ত্বরিত পুনঃ অত্র আগমন ॥
দুই মাস ভূকৈলাস বাটীতে স্থিতি,
মমধাম যে বিশ্রাম সপ্তম রাতি ॥
বৃদ্ধি হবে হৃদিপদ্মে বীজের শক্তি,
শশীইত পরিমিত নিবেদন ইতি ॥ (শ্রীযুতের পদ, পৃঃ ৪৮৯)

এই পত্রালাপ ব্যাপারেই দুলালচাঁদের ব্যক্তিত্বও সে-যুগে তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তির বিষয় কল্পনা করা যায়।[১]

কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ইতিহাস আলোচনায় আরও একটি ব্যাপারে দুলালচাঁদের নাম স্মরণীয়। এই সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ বলিতে বিশেষ কিছু নাই। চৈতন্য চরিতামৃত ইত্যাদি বৈষ্ণবদের সাধারণ ধর্মগ্রন্থই ইহাদের পাঠ্য। সেই দিক দিয়া লালশশী বা শশীলাল ভণিতায় দুলালচাঁদ রচিত প্রায় পাঁচশত পদাবলী ইহাদের নিজেদের ভাষায় নিজেদের কথা। শ্রীশ্রীযুতের পদাবলী [বা ভাবের গীত] নামে সংকলিত এই পদগুলির মধ্যদিয়া এই ধর্মমত ও সম্প্রদায় সম্পর্কে বেশ খানিকটা ধারণা করিয়া লওয়া যায়। পদগুলির ভাষা স্থানে স্থানে হেঁয়ালিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সাধারণত বেশ কবিত্বমণ্ডিত এবং তাত্ত্বিকদিকে তাৎপর্যপূর্ণ। পদগুলির ভাষাতে দুলালচাঁদের বিভিন্ন ভাষাজ্ঞানের পরিচয়ও নিহিত আছে। দুলালচাঁদের 'দু' বাদ দিয়া লালচাঁদ কে লালশশী বা শশীলালে পরিণত করিয়া পদগুলির ভণিতা রচনা করা হইয়াছে। দুলালচাঁদ ভক্তমণ্ডলীতে শ্রীযুত নামে অভিহিত হইতেন—তাই পদগুলি শ্রীশ্রীযুতের পদ নামে সংকলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। পদগুলির মধ্যে দুলালচাঁদের জন্ম-মৃত্যুর তারিখের আভাস আছে। দুলালচাঁদের জন্ম হইয়াছিল ১১৮২ সালের আষাঢ় মাসে. একটি পদে সে কথা আছে। ১২০৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত—পদগুলির মধ্যে তারিখের আভাস আছে। ইহার তিরোভাব হইয়াছিল, যতদূর জানা যায়, ১২৩৯ বঙ্গাব্দে। ঠাকুরমনি নামক জনৈক শিষ্যের একটি পদ শ্রীশ্রীযুতের পদের মধ্যে 'ভক্তের পদ' বলিয়া উল্লিখিত আছে ; তাহাতে ১২৫০ বঙ্গাব্দের উল্লেখ আছে :

১. ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল যে কর্তাভজা ধর্মানুরাগী ছিলেন সে বিষয়ের উল্লেখ ড. সুকুমার সেন একাধিকবার করেছেন। দ্র. কর্তাভজার কথা ও গান-প্রবন্ধ : বিশ্বভারতী পত্রিকা ১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা : ভারতকোষ ২য় খণ্ড 'কর্তাভজা' বিষয়ক আলোচনা এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ ; (৩য় সং) পৃঃ ৫৭৮ পা. টী.। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে ড. মার্শমান ও কেরী রামদুলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং ওঁদের সঙ্গে রামদুলাল ধর্মবিষয়ক বিতর্ক করেছিলেন বলে উল্লেখে আছে Calcutta Review-এর ৬ষ্ঠ খণ্ড ৪০৭ পৃঃ পাদটীকায়।—রামদুলালের খ্যাতি সম্পর্কিত আরো তথ্য সংযোজনে ১—এ দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক

এই বঙ্গ শকের বারশত উনষাট সালে
সত্য সভায় আড্ডা দেক্কে চলো সকলে।

স্বভাবতই পদটি দুলালচাঁদের তিরোধানের পরবর্তী রচনা। যাহাই হউক দুলাল-চাঁদ যে এক হিসাবে এই বংশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন তাহা অনস্বীকার্য।

(ঘ) ঈশ্বরচন্দ্র পাল

দুলালচাঁদের তিরোভাবের পর গদীতে বসেন তাঁহার চতুর্থ পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র। ঠাকুর বংশের শেষ যোগ্য প্রতিনিধি ইনি। ইনিও নির্লোভ নিরহংকার—সাধক পুরুষ ছিলেন।[১] ভক্তবৎসল বলিয়া ইহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। ইহার সময়কার উল্লেখযোগ্য ঘটনা কৃষ্ণনগরের রাজাদের সহিত যোগাযোগ। কথিত আছে ফকির ঠাকুরের আমল হইতে ঘোষপাড়াতে বৈশাখী পূর্ণিমাতে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হইত। কৃষ্ণনগরের রাজা এই শাস্ত্র বহির্ভূত অকাল রথোৎসব বন্ধ করিতে পাইক প্রেরণ করেন। ভক্তেরা ভয়ে রথের রজ্জু টানা বন্ধ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের শরণাপন্ন হন। ঈশ্বরচন্দ্র তাহাদিগকে আশ্বাস দেন যে হাতে না টানিলেও মনের টানে রথ চলে। সত্যই নাকি রথ চলিয়াছিল বলিয়া শোনা যায়। ঘটনার সত্য মিথ্যা যাচাই করিবার উপায় নাই। তবে ঐ অকাল রথযাত্রা উৎসব এখনও অব্যাহত আছে। শোনা যায় ঘটনার পর কৃষ্ণনগরের রাজা ঈশ্বরচন্দ্রকে রাজবাটীতে আহ্বান করেন। কিন্তু নির্লোভ ঈশ্বরচন্দ্র—নিজেকে দরিদ্র ফকির বলিয়া উল্লেখ করিয়া সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হয় ১২২০ বঙ্গাব্দে এবং তিরোভাব হয় ১২৮৯ বঙ্গাব্দে। ঈশ্বরচন্দ্রের পরও এই বংশের অধস্তন পুরুষেরা যথারীতি কর্তা হইয়া আসিতেছেন এবং রামশরণের মত সকলেই 'দেবমহস্ত' উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকেন। তবে ঈশ্বরচন্দ্রের পর হইতে পরিবার নানাভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে এবং ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী বলিয়া বিশেষ আর কাহারও পরিচয় পাওয়া যায় না।

(ঙ) কানাই ঘোষ

ফকিরের বাইশজন শিষ্যের সকলেরই শিষ্য প্রশিষ্য হইতে এই সম্প্রদায়ের প্রসার ঘটিয়াছে। এই বাইশজন শিষ্যের মধ্যে আটজন আবার ছিলেন কিঞ্চিৎ

১. দেবেন্দ্রনাথের এই উক্তির সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। ঈশ্বরচন্দ্রের স্খলিত চরিত্র ও বিলাসব্যসন সম্পর্কে তির্যক উক্তি আছে বহু আলোচনায়। নদীয়া কাহিনীতে আছে: ঈশ্বরচন্দ্র নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লোক ছিলেন; তাহার ফলে এমন কি তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য রাজকীয় কারাগারে আবদ্ধ থাকিতে হয়।' পৃঃ ২৪৬। Calcutta Review Vol. VI পৃঃ ৪০৭ এর পাদটীকায় আছে 'the present head of the sect (অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্র) lives in the style of a Rajah'. এমন উক্তি আরো আছে। মনে হয়, ঈশ্বরচন্দ্রের সময় থেকেই এই ধর্মের পতন শুরু এবং লক্ষণীয় এই ধর্ম সম্পর্কে ব্যাভিচার-দোষ প্রভৃতি যে সব নিন্দা উক্তি শোনা যায় তার সবগুলি এর সমসাময়িক।—সম্পাদক

প্রধান—হটু ঘোষ, বেচু ঘোষ, হরি ঘোষ, কানাই ঘোষ, নিধিরাম (মতান্তরে সহস্ররাম) ঘোষ, ভীমরায় রাজপুত, শ্যাম বৈরাগী ও রামশরণ পাল। (দ্র. কর্তাভজার কথা ও গান) ইহাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব শিষ্য সম্প্রদায় ছিল, তবে প্রত্যেকেই ঘোষপাড়ার প্রাধান্য ও অধিনায়কত্ব স্বীকার করিতেন। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে—এই শিষ্যগণের সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য অবগত হওয়া যায় না। 'সত্যস্রোত' নামক গ্রন্থে শ্রীযুক্ত হারাধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় কানাই ঘোষ ও তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণের অনেক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেখানে অবগত হওয়া যায় যে কানাই ঘোষের আদি নিবাস ছিল কাঁচড়াপাড়া। বাল্যকাল হইতে ইনি সন্ন্যাসী ভাবাপন্ন ছিলেন। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর পুত্র বিশ্বম্ভর অত্যন্ত দুর্দান্ত ও মদ্যপ হইয়া উঠে। দুঃখে কানাই ঘোষ গৃহত্যাগ করিয়া ফকিরী গ্রহণ করেন। ১৫-২০ বৎসর পর গৃহে ফিরিয়া ফকির ঠাকুরের সাক্ষাৎ পান এবং দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ফকিরের আদেশে পুনরায় দার পরিগ্রহ করিয়া সংসারী হন। ইহার শিষ্য পরম্পরার সংখ্যা প্রচুর এবং ইহাদের মধ্যে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিও বিদ্যমান। ধর্মমত ও সম্প্রদায়ের প্রচার ব্যাপারে কানাই ঘোষের অবদান স্বীকার্য।[১]

---

১. রামশরণ পালের মত কানাই ঘোষও নিজের নেতৃত্বে স্বতন্ত্র আশ্রম (গদি) গঠন করেন। যে কোন কারণেই হোক রামশরণ পালের প্রাধান্যই বেশি প্রচারিত হয়। তবে রামশরণ পাল ও কানাই ঘোষ প্রচারিত ধর্ম যে এক—তা এঁদের শিষ্য প্রশিষ্যেরা স্বীকার করেন। রামশরণ পালের পুত্র পৌত্রেরা ঐশ্বর্যশালী হয়েছেন—কিন্তু কানাই ঘোষের বংশধররা তেমন হতে পারেন নি। সত্যস্রোত গ্রন্থ অনুসারে কানাই ঘোষের বংশানুক্রম : পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, তাঁর পুত্র রাজেন্দ্র ঘোষ—তাঁর পুত্র খগেন্দ্র ঘোষ—তাঁর পুত্র গোষ্ঠবিহারী ঘোষ।—সম্পাদক

তৃতীয় অধ্যায়

কর্তাভজা ধর্মের মূলনীতি ও সাধনপদ্ধতি

এক

কর্তাভজা ধর্মের আচরণীয় বিধিনিষেধ,—ইহাদের সাধনপদ্ধতি অথবা ধর্ম সম্বন্ধীয় মূলনীতি ইত্যাদি—সম্পর্কে আলোচনা করা খুব দুরূহ। সমাজের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অতি সহজ সরল পদ্ধতির ভিতর দিয়া প্রচারিত এই ধর্মে স্বভাবতই জটিল দার্শনিক ভিত্তি খুব বেশি কিছু ছিল না। যেটুকু-বা ছিল তাহাও উদ্ধার করা সহজ নহে কারণ এই ধর্মসম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ বলিতে কিছুই নাই। পরবর্তীকালে মেলায় বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সতী-মা মাহাত্ম্য, ঘোষপাড়া মাহাত্ম্য ইত্যাদি জাতীয় যে পুস্তিকাগুলি দেখা যায় তাহাতে যুক্তিহীন ভক্তির কথাই কিছু কিছু আছে—তথ্যাদি কিছুই নাই। উপযুক্ত পুথি পুস্তকের অভাবে—এই ধর্মের সাধনপদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রামাণিক কথা বলা দুরূহ। তাহা ছাড়া এই ধর্মের ভক্ত ভাগবজ্জনেরা প্রচার বিমুখ, গুপ্ত সাধক। সাধারণত সমাজের মধ্যে প্রচলিত সাধারণ রীতি নিয়ম ইহারা, অন্তত আধুনিককালে, বিনা দ্বিধায় মানিয়া চলেন। ইহাদের মধ্যে একটি নীতি প্রচলিত আছে—"লোক মধ্যে লোকাচার—সদ্‌গুরুর মধ্যে একাচার"। অর্থাৎ স্ব সম্প্রদায়ীদের মধ্যে এবং গুরু সন্নিধানে ইহারা নিজেদের ধর্মীয় সাধনপদ্ধতি পালন করেন কিন্তু সমাজের অন্যান্য জনসাধারণের মধ্যে ইহারা সাধারণ সামাজিক রীতিনীতি লোকাচারই পালন করিয়া থাকেন। ধর্মীয় সাধনপদ্ধতি তাই যাহা কিছু আছে তাহা ইহারা গোপনীয়তার সহিত পালন করেন। যাহা হউক এই ধর্মের অন্যতম প্রচারক সাধক দুলালচাঁদ বা রামদুলাল কৃত "শ্রীশ্রীযুতের পদ" নামক—ইহাদের একমাত্র সাধনসঙ্গীত গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া এবং অন্তরঙ্গ সাহচর্যের ভিতর দিয়া এই ধর্মের মূলনীতি ও সাধনপদ্ধতি সম্পর্কে যেটুকু অবগত হইয়াছি তাহাই বিবৃত করিতেছি।

দুই

(ক) প্রতিবাদী মনোভাব

কর্তাভজাদের সাধনসঙ্গীতে বহুপদ আছে যেখানে বেদতন্ত্র পুরাণ ইত্যাদির ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করিয়া সহজ সরলভাবে মনের মধ্যে পরমেশ্বরকে অনুধাবনের কথা বলা হইয়াছে। একটি পদে আছে :

যত তন্ত্র বেদান্ত আর যে আগম ক্রম না বুঝে
না ভজে সহজে বৃথা হে মজে,
বিদগদ নগদি মহাজন অগধি জলধি বিশেষণ
গ্রহণ না হল গেল অন্ধকারেতে।

* * *

বর্তমান সত্য জ্ঞান যথা সম্ভব
অনুমান অনর্থক বৃথা হে ভাব
যাহার সহিত হে আচার সর্বদায়
সেই ত সার প্রতিকার নিস্তার তথায়। ইত্যাদি (পৃঃ ৪৬)

সহজকে উপলব্ধির জন্য তন্ত্র বেদান্ত আগম পুরাণের ব্যর্থতার ইঙ্গিত পদটির মধ্যে সুস্পষ্ট। সহজকে মনের মধ্যেই উপলব্ধি করিতে হইবে, 'দেহভাণ্ডেই' তিনি অবস্থান করিতেছেন। 'বর্তমানেই'[১] সত্যজ্ঞান সম্ভব; বেদ পুরাণের 'অনুমান'[১] পন্থা নিরর্থক। আর একটি পদেও আছে :

এত শাস্তরে শাসনে বিধানে ধ্যানে নাই
মনে মনে বিবেচনা কোরে দেখনা ভাই···(পৃঃ ৩৫)

অনুরূপ আর একটি পদে পাই :

ওরে মন অনন্ত অপার গুরু নামের মহিমে
বেদাগমে সাধ্য নাই কহিতে সীমে···(পৃঃ ৫/২য় ভাগ)

এই ধরণের উক্তি বহু পদের মধ্যেই পাওয়া যায়। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি কর্তাভজা ধর্ম সহজিয়া ঐতিহ্যের ধারক। তাই যে কোন সহজিয়া মতের মত কর্তাভজা মতও বেদবিরোধী। এই 'বেদবিরোধী' শব্দটির সামান্য ব্যাখ্যা প্রয়োজন। বৈদিক আমল হইতেই দেশে এমন কোন কোন সম্প্রদায়ের সন্ধান পাওয়া যায় যাহারা বেদাচার মানিত না। বেদেই এই বেদবিরোধীদের কথা উল্লিখিত আছে। ইহারাই ভারতের আর্যপূর্ব সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। তান্ত্রিকতা এই জাতীয় বেদবিরোধী সাধনপদ্ধতি। এমন কি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মও এক হিসেবে বেদবিরোধী। এই সমস্ত ছোট বড় বিভিন্ন বেদবিরোধী ধর্মের একটি মূল লক্ষ্য ছিল বিশিষ্ট কোন শাস্ত্রের বেড়াজালে নিজেদের সাধনাকে সীমাবদ্ধ না করা। তাই তাহারা সর্বদা যে শুধু বেদকেই নিন্দা করিয়াছে তাহা নহে বরং অনেক সময় ইহারা বেদের গুণগান করিয়াও শাস্ত্রীয় আচার আচরণের গোঁড়ামির বিরোধীতা করিয়াছে। বেদবিরোধীতা বলিতে সুতরাং এই গোঁড়ামি-বিরোধীতা, এই শাস্ত্রীয় আচার আচরণের বেড়াজাল হইতে সাধনাকে

১. অনুমান বর্তমান ইত্যাদি শব্দের ব্যাখ্যা পরে দ্রষ্টব্য।

মুক্ত করিবার মনোভাবকেই বুঝায়। অর্থাৎ ইহা একটি প্রতিবাদী মনোভাব। যাহা প্রচলিত, তাহার বিরোধীতা করিয়া সহজ সরল নূতনের প্রবর্তন করাই ইহাদের লক্ষ্য। কর্তাভজা ধর্মের মধ্যে এই মনোভাব বেশ লক্ষ্য করা যায়। ইহারা শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠানের ধার ধারেন না। সহজ সরল অনাড়ম্বর পদ্ধতিতে জীবন যাপন এবং কতকগুলি সুনীতি মানিয়া চলা ইঁহাদের মুখ্য কথা। তবে শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠানের বিরোধীতা করিলেও পূর্বোক্ত লোক মধ্যে "লোকাচার সদ্‌গুরুর মধ্যে একাচার" এই নীতি অনুসরণ করিয়া ইহারা বিভিন্ন প্রতিমা ইত্যাদির পূজাও করিয়া থাকেন। ইঁহাদের সাধন সঙ্গীতের মধ্যে সে জাতীয় পদও দু-একটি লক্ষ্য করা যায় :

ওরে মন মগ্ন হও আনন্দময়ীর নাম গুণগানে
কালী কালী তারা তারা বল রসনে
জয়তি জয়তি জয়া গো জগদম্বে জগদীশ্বরী
জঠর যন্ত্রণা হরা জয় বিশ্বহরি
যোগমায়া যোগ্যে যোগাঙ্গে
জগমন মোহিণী জগতের আদ্যে…(পৃঃ ৬/২য় ভাগ)

বাউলদের সহিত তুলনায় এই শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠানের বিরোধীতা প্রবণতা ইহাদের মধ্যে অনেক কম। এই তীব্রতার স্বল্পতা ইহাদের উদ্ভব কালের আধুনিকতাই সূচিত করে। তাহা ছাড়া মনে হয় ফকির ঠাকুরের মূল শিক্ষা বাউলদের অনুরূপ বা কাছাকাছি কিছু। কিন্তু পরে ইহাদের মধ্যে প্রতিমা পূজা বা বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে।

(খ) গুরু প্রাধান্য

কর্তাভজাদের সাধনপদ্ধতিতে গুরুর প্রাধান্য সহজেই চোখে পড়ে। গুরুকে ইহারা 'মহাশয়' নামে অভিহিত করে--এবং একদিকে তাঁহার উপদেশ নির্দেশে যেমন সাধনার পথে অগ্রসর হয় অন্যদিকে তেমনি তাঁহাকেই আরাধ্য রূপে পূজা করে। শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠানের বাহিরে ইহা একটি নূতন সাধনপদ্ধতি সুতরাং গুরুর উপদেশ নির্দেশে নির্ভরতা এবং গুরুর প্রাধান্য এখানে খুবই স্বাভাবিক। বস্তুত সমস্ত যৌগিক তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতিতে গুরুবাদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এক হিসাবে ভারতীয় সমস্ত সাধনাতেই গুরুর উপদেশ নির্দেশ মানিয়া চলার কথা আছে। প্রত্যেকটি ভারতীয় ধর্মেই জ্ঞান মননের দিক ছাড়াও ব্যবহারিক ক্রিয়ামূলক একটি দিক আছে। যাঁহারা ধর্মের তত্ত্ব এবং ক্রিয়া উভয়দিকে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাঁহারাই ধর্মজ্ঞ, তাঁহারাই গুরু, তাঁহারাই পারেন অন্যকে এই পথে পরিচালিত করিতে। গুরু ব্যতীত ধর্মের মূল হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। তাই ভারতীয় প্রায় প্রত্যেকটি ধর্মে গুরুর প্রাধান্য। যেসব ধর্ম

আবার কর্মকাণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাদের মধ্যে গুরুর প্রাধান্য আরও বেশি। তন্ত্র একান্তই ক্রিয়াপ্রধান, তাই তাহাতে গুরু ব্যতীত এক পাও চলিবার উপায় নাই। হিন্দুতান্ত্রিক ধর্ম, বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্ম, সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম, বাউল ধর্ম প্রভৃতি গূঢ় সাধনার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—এই সমস্ত ধর্মেই গুরুর স্থান সর্বোচ্চে। সুফী ধর্মেও কিছু যোগমূলক ক্রিয়া পদ্ধতি আছে ; সেখানেও তাই মুর্শিদের উচ্চাসন লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় নাথধর্মও গুরুপ্রধান ধর্ম। মধ্যযুগের সন্ত সাধক কবীর দাদু রামানন্দ ইত্যাদির সাধনাও গুরুবাদী।[১] ভারতীয় এই সমস্ত বিভিন্ন ধর্মে গুরু শুধু পথপ্রদর্শকই নন—তিনি আরাধ্য দেবতা। বৈদিকধর্ম গুরুপ্রমুখাৎ শিষ্যের নিকট আসিয়াছে। সেখানে গুরুকে আরাধ্য দেবতা হিসাবে পূজা আরাধনার কথা না থাকিলেও তত্ত্বজ্ঞান লাভের পক্ষে তত্ত্বজ্ঞের উপদেশ যে অপরিহার্য তাহা স্বীকার করা হইয়াছে। তন্ত্র সাধনায় গুরুকে স্পষ্টভাবেই ঈশ্বরে পরিণত করা হইয়াছে :

ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্তিঃ পূজামূলং গুরো পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরো কৃপা ॥[২]

বাউলধর্ম একান্তই গুরুবাদী ধর্ম। তাহাদের বহু সঙ্গীতেই গুরু আরাধনার কথা আছে।

কর্তাভজারা গুরুকে তাঁহাদের সাধনায় অতি উচ্চ আসন দিয়াছেন এবং গুরুকে পথ প্রদর্শক ও দেবতা উভয় রূপেই পূজা করিয়াছেন। শ্রীশ্রীযুতের পদে বহুস্থানেই গুরু মহিমা, গুরু শরণের কথা লেখা আছে।

ওরে রসনা মত্ত হও নাম রস পানে
রসনা শ্রীগুরুর পদারবিন্দ
তাতে আছে মকরন্দ
ধারণ কর আনন্দ মনে
ভয় যায় যার স্মরণে,
ধড়ে আছে প্রাণরে যতক্ষণ,
নৃত্য ও কীর্তনে রত হওরে ততক্ষণ।

১. It will be seen that all the systems of Indian Philosophy and religions are mystic, for according to all the systems truth always transcends intellectual apprehension or discursive speculation, It is to be intuited within through the help of the preceptor, who has already realised it. (Obscure Religious cults P. 101-102)

২. কুলার্ণবতন্ত্র। বাংলার বাউল ও বাউলগানে উদ্ধৃত পৃঃ ৩১৫।

ওরে কালেক্কে কাল আসিবে
ভাবলে না তার কি হবে
ক্ষমা নাইরে ঐ নাম বিনে। (পৃঃ ৪/২য় ভাগ)

অনুরূপ আর একটি পদে আছে :

শ্রীগুরুর নাম অমৃত সেবন
কররে সব বন্ধুগণ
বিশেষণ স্মরণ মনন
নিরীক্ষণ তত্ত্ব উপাখ্যান
ভক্ত সে ভাজন জ্ঞান
হৃদিপদ্মে সর্বদা ধারণ
ঐ নাম রস পরশ হলে
বশ জানিবে ত্রিভুবন। (পৃঃ ২৩/১ম ভাগ)

আর একটি পদেও আছে :

মন, গুরু ব্রহ্ম গুরু বিষ্ণু ভজ হৃদয়েতে
মনের ভ্রম সকল দূরে যাবে,
ভোলামন শ্রীগুরুর কৃপাতে। (পৃঃ ২৬৫/২য় ভাগ)

ভাবের গীতের এমন বহু পদেই গুরুপ্রসঙ্গ আছে এবং তাহার বেশির ভাগ স্থানেই গুরুকে পরম আরাধ্য দেবতারূপে পূজা করার কথা আছে। প্রথমে যাহাই থাকুক, পরবর্তীকালে অন্তত, ইহাদের মধ্যে যে গুরুপূজার প্রধান্য দেখা দিয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ঘোষপাড়ার দোল মেলা উপলক্ষে সমাগত ভক্তদের মধ্যে গুরুপূজা বিষয়ক মনোভাব সম্পর্কে বিশেষ শ্রদ্ধাপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার আত্মজীবনীতে। তিনি লিখিয়াছেন : "এই সব দেখিয়া ও শুনিয়া আমার হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ হইয়াছিল। তাহার উপর এই মহাশয়দের সরল ব্যাখ্যা শুনিয়া আমার সেই ভক্তিভাব দৃঢ়তর হইল। আমার বোধ হইল কর্তাভজা রূপান্তরে হিন্দুর গুরুপূজা মাত্র॥"[১] Nadia District Gazetteer-এ কর্তাভজা ধর্ম আলোচনা প্রসঙ্গে রামশরণ পালের অধস্তন পুরুষ বাবু (বর্তমানে স্বর্গীয়) গোপালকৃষ্ণ পালের একটি বিবৃতি ছাপা আছে। গোপালবাবু প্রসঙ্গক্রমে লিখিয়াছেন : "Ours is not a guruworshipping sect, as some has taken it to be. In fact as a safe-guard against any possible misconception as to the rights and obligations of a religious preceptor and the consequent misuse of his privilages, the terms 'guru' and 'sishya' are never employed

১. দ্র. আমার জীবন ৪র্থ খণ্ড।

among us ; on the contrary the words used are 'mahashaya' and 'Varati'. * * * It will thus be seen that the 'mahashaya' is merely a teacher and has no right to exact any divine homage from his 'Varatis." (P. 49) এই উক্তির সবখানি সঠিক নহে বলিয়া মনে হয়। কারণ একেবারে 'Guruworshipping sect' না হইলেও কর্তাভজারা যে তাঁহাদের সাধনপদ্ধতির মধ্যে গুরুকে ইষ্টদেবতার তুল্য মনে করিয়া ভক্তি শ্রদ্ধা করাকে অন্যতম কর্তব্য বলিয়া মনে করে তাহার প্রমাণ শ্রীশ্রীযুতের পদে অনেক স্থানেই লক্ষণীয়—এবং কর্তাভজাদেরআচার আচরণের মধ্যেও তাহার বহু নিদর্শন রহিয়াছে। কর্তাভজাদের মধ্যেও নিশ্চয়ই এই মনোভাব বিষয়ে কালক্রমে যথেষ্ট বিবর্তন ঘটিয়াছে। হয়ত প্রথমে তাঁহারা গুরু তাঁহাদের সাধন পথের পথপ্রদর্শক, সুতরাং শ্রদ্ধেয়—এই দৃষ্টিতেই দেখিতেন ;—পরে সেঁই গুরুই হইলেন আরাধ্য দেবতা। এ ব্যাপারে বাউলদের সহিত কর্তাভজাদের কোন পার্থক্য নাই। এ মনোভাব যদি নিন্দনীয় হয় তবে সে নিন্দার ভাগী ভারতীয় মাত্রেই। চিরকালই গুরুরা শিষ্যকে উপদেশ দানের সময় একটি নির্ভরতার মনোভাব শিষ্যের মধ্যে সৃষ্টি করেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনকে উপদেশ দিতে দিতে বলিয়াছেন :

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ১৮।৬৬

এই মনোভাব হইতেই গুরুকে আনুষ্ঠানিকভাবে পূজা করার পদ্ধতিও দেখা যায়। অবশ্য কর্তাভজাদের মধ্যে গুরুকে আরাধ্য দেবতাতুল্য মনে করিবার রীতি প্রচলিত থাকিলেও আনুষ্ঠানিক পূজার রীতি দেখা যায় না। গুরু সাধন-পথে আলোক বর্তিকা ধরিয়া পথের সন্ধান দেন, তাঁহার নির্দেশেই ধীরে ধীরে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে হয়—এই জাতীয় মনোভাবের গানও শ্রীযুতের পদে বিরল নয় :

যদি কল্পতরু শ্রীগুরু করেন করুণা
অকালে সকালে ফল ফলে কল্পে ধরে না,
কল্পবৃক্ষ সখা হইবে নিজে মূর্খ বুঝি সূক্ষ্ম
দুঃখ ঘুচিবে
আমার হৃদয় সরোজের মাঝে বিষয় আছে
সাধুর আজ্ঞাতে বাগিচে বানাব···(পৃঃ ১৬৭/২য়)

এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত সঙ্গীতটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় কারণ ইহাতে গুরু যে সাধন-পথের পথপ্রদর্শক এবং সেই জন্যেই তিনি আরাধ্য এই মনোভাবটি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে :

সার কর মন গুরু করুণা সিন্ধু চরণ যুগল
ও যদি ভবে এসেছ যাতে হইবে এ জনম সফল
ত্রাণ হবার যদি জান কল।
মনে কর এ ঘোর পাথার
শ্রীগুরু বিনেরে ভাই কে করে নিস্তার
বল বুদ্ধি সাধ্য মাত্র ভেবে দেখ সেই কেবল॥

* * *

অন্য বিষয়তে আছ যতক্ষণ ক্ষান্ত হয়ে চিন্তা কর মন
ওরে শ্রীগুরু চরণ,
যে পদে স্মরণেরে ভাই ভ্রান্তি যায়
তারে না ভেবে কি মতে বল পার হইবে
এই ভবার্ণবে
অকাতরে করুণা করে সেই আর কে আছে ত্রিকুল সংসারে
তারে ভাবলে প্রফুল্লিত হয় হৃদি কমল। (পৃঃ ১৩৭/২য় ভাগ)

(গ) ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড বাদ সম্পর্কে আগ্রহ

সমস্ত সহজিয়া ধর্মের মধ্যেই ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডবাদ নামে একটি তত্ত্বের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় সহজিয়ারা বিশ্বাস করেন পরমতত্ত্ব দেহের মধ্যেই আছেন, তাঁহাকে দেহের বাহিরে অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহাদের মতে এই দেহভাণ্ডেই ব্রহ্মাণ্ড অবস্থান করেন—তাই সংক্ষেপে এই তত্ত্বকে ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডবাদ নামে অভিহিত করা হয়। আমাদের দেশে প্রাচীনতম সহজিয়া বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের সাধনাতেও এই তত্ত্ব ছিল ; দোহাকোষে একটি সুন্দর পদ আছে :

ঘরেঁ অচ্ছই বাহিরে পুচ্ছই
পই দেকখই পড়িবেসী পুচ্ছই॥

প্রিয়তম স্বামী ঘরেই আছেন বাহিরে তাহাকে অনুসন্ধান করিতেছ ? তাহাকে দেখিতেছ অথচ প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করিতেছ ? হেঁয়ালির মধ্য দিয়া এখানে দেহের মধ্যেই পরম তত্ত্ব নিহিত সে-কথা বলা হইয়াছে। কোন কোন স্থানে হেঁয়ালি বাদ দিয়া স্পষ্টতও বলা হইয়াছে, যেমন :

পণ্ডিঅ সঅল সত্থ বক্‌খানই।
দেহহি বুদ্ধ বসন্ত ন জানই॥

অথবা এথু সে সুরসুরি জমুণা এথু সে গঙ্গা সাঅরু।
এথু সে পআগ বণারসি এথু সে চন্দ দিবাঅরু॥

কৃথেত্তু পীঠ উপপীঠ এথ্ু মই ভমই পরিটঠও।
দেহা সরিসঅ তিথ্ু মই স্থহ অন্ণ ণ দীটঠও॥

অর্থাৎ এখানেই (দেহের মধ্যে) সুরেশ্বরী (গঙ্গা) যমুনা, এখানে গঙ্গাসাগর। এখানেই প্রয়াগ বারাণসী. চন্দ্র, সূর্য. ক্ষেত্র, পীঠ. উপপীঠ, তীর্থক্ষেত্র ও সুখভূমি। এমন আর কোথাও দেখি না।

বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউলদের সাধনাতেও এই দেহভাণ্ডের গৌরব। কর্তাভজাদের মধ্যেও ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডের কথা পাওয়া যায়:

কাণ্ড সকলি খণ্ড যে এ ভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডেতে
কি হবে স্বভাবে কেবা থাকিবে
ভ্রান্ত আশ রঙ্গ রসে
ক্ষান্ত বাস ভঙ্গ যে শেষে। (পৃঃ ৪৪/১ম ভাগ)

অথবা

যে ব্রহ্মাণ্ডে সেই ত ভাণ্ডে সত্য যদি হয়
অন্তরঙ্গ তারির সঙ্গ বৈরাগ্য ত নয়,
যেমন হাতের কলে কাঠ পুতুলে নাচায় কুহকে
আজ নাইক ধাঁদা আছে বাঁধা বলছে সে ডেকে
লালশশী বলে ঘুচলে ঘোচে মনের সন্দ। (পৃঃ ২৩/২য় ভাগ)

(ঘ) মানব মহিমা

সমস্ত পরমার্থ দেহভাণ্ডে নিহিত—এই তত্ত্ব একদিকে যেমন দেহের মহিমা বৃদ্ধি করে তেমনি পরোক্ষে দেহের অধিকারী মানুষের মহিমাও বৃদ্ধি করে। এক হিসাবে তাই সহজিয়া ধর্মমাত্রেই মানবতাবাদী। অবশ্য আধুনিক কালে মানবতা-বাদ বা Humanism বলিতে যাহা বুঝায় সহজিয়াদের মানবতাবাদ তাহার সহিত সর্বাংশে এক নয়। তবুও আমাদের যে একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাঙ্গালী তথা ভারতীয়দের মধ্যে মানবমাহাত্ম্যে বিশ্বাস বলিতে কিছু ছিল না—একথাটিও সত্য নয়। অদ্বৈতবাদী দার্শনিকতা যেখানে ব্রহ্মকে এক-মাত্র সত্য বলিয়া. অন্য সব কিছুর সহিত মানুষকেও মিথ্যা মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল সেখানে পরোক্ষভাবেও মানবমহিমাজ্ঞাপক যেটুকু কথা পাওয়া গেল তাহাই আমাদের গৌরবের পরিচায়ক। বস্তুত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙ্গালীদের মধ্যে মানবতাবাদী এই দৃষ্টিভঙ্গী এক হিসাবে সহজিয়াদেরই বিস্ময়কর অবদান। চণ্ডীদাসের মত:

শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই……

এমন জোর করিয়া বলিতে না পারিলেও বৈষ্ণবধর্ম ও শাক্তধর্মের মধ্যেও এই মানবতার বাণী অনুপস্থিত নয় :

কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ

বৈষ্ণবদের এই উক্তি মানব-মাহাত্ম্য স্বীকৃতির নির্ভুল প্রমাণ। শাক্ত কবি রামপ্রসাদও আধ্যাত্মিক কর্ষণার জন্য মানব জমির অনুসন্ধান করিয়াছিলেন :

মনরে কৃষি কাজ জানো না
এমন মানব জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা।

কর্তাভজাদের বহু গানেও এই মানুষের কথা। মানুষ কখনও কখনও সেই পরমতত্ত্ব—অর্থাৎ মানুষই ভগবান, Anthromorphism এর চূড়ান্ত ; আবার কখনও কখনও মানুষ বলিতে পার্থিব মানুষের কথা বলা হইয়াছে। ভেদ বিভেদের ঊর্ধ্বে তুলিয়া সকল মানুষকে সমান মনে করিয়া সেই মানুষের মধ্য দিয়া ভগবানের অন্বেষণ কর্তাভজাদের এই গানগুলির মধ্যে লক্ষ্য করা যায় :

ভেদ নাই মানুষে মানুষে খেদ কেন ভাই এ দেশে
দেখহে সহজে স্বভাবে বুঝে
দেশে দেশে অশেষ প্রকার মানুষে মানুষে ব্যবহার
আচার বিস্তার সেই এই সবাই বসে।

* * *

ধন্য সব মানব হৃদয়
ভিন্নভাব সম্ভব না হয়
ভাবত ভাবত নিত্য নারী পুরুষে। (পৃঃ ৪২/১ম ভাগ)

অন্যত্র : মানুষেরই বসতি শুন আনন্দেরই ধাম
অতল সিন্ধুর পারে সে রাজ্য নিষ্কাম
আছে মানুষে মানুষে যার ভেদাভেদ জ্ঞান
সে রাজ্যে গমনে তার মিলিবে না সন্ধান,
ভাই তুমি আমি ছেড়ে ভজ তুমি
তবে কে আমি কে তুমি সর্বভূতে। (পৃঃ ৩৬৭/২য় ভাগ)

আর একটি পদেও আছে :

মানব দুর্লভ উদ্ভব ভবে
এ ভব সম্ভব অভাব কবে
লাভের লাভি যে হয় বাঞ্ছিত

ভাবের ভাবি সে অকিঞ্চিত বঞ্চিত
বিধাতায় তায় হায় কি হবে হে। (পৃঃ ৪৬/১ম ভাগ)

মানুষে মানুষে মৈত্রী ও সমদৃষ্টির এমন উদার উদাত্ত বাণী, দুর্লভ মানব উদ্ভবের এই সুস্পষ্ট মহিমা-কীর্তন যে আধুনিক-পূর্ব যুগেও সম্ভব ছিল সে-কথা ভাবিতেও বিস্ময় বোধহয়। অবশ্য কখনও কখনও যে কর্তাভজারা ঈশ্বরকেই মানুষ বলিয়াছেন সে দৃষ্টান্তও বিরল নয় :

ভাইরে মানুষ মানুষ তিন মানুষ হয় জগতের সার
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন মানুষ প্রচার…(পৃঃ ২১/২য় ভাগ)

কিন্তু পৃথিবীর মানুষও যে দেবতার সমান, দেব-উদ্ভব, পরমেশ্বর তাই মানুষের বেশেই লীলা করেন—এই কথা মানুষেরই মহিমা প্রচার করে :

সত্যময় সত্যেশ্বর এই জগতে প্রচার
সহজ মানুষের বেশে
এসে ভাই সেতো এই প্রদেশে
এবার ইচ্ছা করে কল্লে তাই ত
যাতে জীবের হয় নিস্তার…(পৃঃ ২৫/২য় ভাগ)

(ঙ) মনের মানুষ তত্ত্বের প্রভাব

বাংলার বাউল ধর্মের একটি বিশেষ দিক মনের মানুষ পরিকল্পনা। সহজিয়াদের মূলনীতি 'দেহভাণ্ডেই ব্রহ্মাণ্ড'—এই মূলনীতি হইতে মনের মানুষ তত্ত্বের উদ্ভব। এই মনের মানুষ ধারণায় উপনিষদের ব্রহ্মবাদ এবং সুফী সাধকদের আনলহক ও নসুত্‌ লহুত্‌ তত্ত্বের সুস্পষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বাউলদের মনের মানুষ পরিকল্পনায় উপনিষদ ও সুফীবাদের প্রভাব আছে বলিয়া পণ্ডিতগণের অভিমত। সে যাহাই হউক, এই মনের মানুষই সহজিয়াদের 'সহজ'। বৌদ্ধ সহজিয়ারা দেহের মধ্যে উৎপন্ন প্রজ্ঞাও উপায়ের মিলিতাবস্থার অনুভূতি বিশেষকে বলিয়াছেন 'সহজ'। বৈষ্ণব সহজিয়াদের মতে এই 'সহজ' রাধা ও কৃষ্ণের মিলিতাবস্থা। বাউলদের এই 'সহজ' মনের মধ্যে মানুষের মানবিক সত্তা ও দৈবসত্তার মিলন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে একটি মানবিক সত্তা—সুফীদের ভাষায় নসুৎ (Human personality) এবং একটি দৈবসত্তা—সুফীদের ভাষায় লহুৎ (Divineperonality)। যৌগিক প্রক্রিয়ায় এই উভয়ের মিলন ঘটাইয়া পরম স্বরূপ মনের মানুষকে উপলব্ধির মধ্য দিয়া চরম সিদ্ধিলাভই বাউলদের সাধনার মূলতত্ত্ব। উপলব্ধির দিকে ব্রহ্মোপলব্ধির সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও—ব্রহ্মোপলব্ধি একান্তই মনের মাধ্যমে সাধিত হয়। কোন বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ সেখানে প্রয়োজনীয় নহে। কিন্তু বাউলদের সাধনায় তান্ত্রিক যৌগিক ক্রিয়া পদ্ধতির

কথা আছে। অবশ্য তাহা সত্ত্বেও মননগত উপলব্ধির প্রাধান্যের কথাও বাউলদের মধ্যে কম নাই। সে যাহাই হউক, কর্তাভজাদের মধ্যেও এই মনের মানুষ তত্ত্ব লক্ষ্য করা যায়:

আঁখি ভোরে যারে হেরে হচ্ছে আনন্দ
ঘুচিল মনেরি সন্দ,
সে মানুষ কোথায় রে বোলে নাই কোন সন্দ
সে মনের মানুষ মনে আছে
দিবারাতি তারির কাছে
হৃদয় মাঝে সেই সদানন্দ (পৃঃ ২৩/২য় ভাগ)

আর একটি পদেও পাওয়া যায়:

মন কি তোর মনের মানুষ চিন্তে পারলিনে
ওরে যে তোরে সাজিয়েছে
রাজ্যভার দিয়েছে
সে কোথা অন্বেষণ তো কল্লিনে
স্বচক্ষে তুই সে লোককে তাকিয়ে দেখলিনে। (পৃঃ ৩৬/২য় ভাগ)

অন্য একটি পদেও আছে:

মিলবে তোর মনের মানুষ যা বলি তাই শোন
গুরুভক্তি অভিলাষে থাকবি তো বসে
নাম ধরে ডাকবি ওরে ভোলা মন (পৃঃ ৩৪/২য় ভাগ)

কিম্বা· কাজ কি তোর মনের মানুষ বাইরে বার করে
সদা নিত্যসুখী হয়ে আত্মায় মিশাইয়ে
বসাইয়ে রাখরে হিয়ার মাঝারে·········(পৃঃ ৩৯/২য় ভাগ)

এই মনের মানুষ বাউলদের ন্যায় কর্তাভজাদের নিকটও 'সহজ'। কর্তাভজারা ইহাকে সহজধন 'সহজনিধি ইত্যাদি নামে বারবার অভিহিত করিয়াছেন। এই সহজধন শুধু যে নিজের অন্তরের মধ্যেই রহিয়াছেন তাহা নহে, মানুষের পার্থিব সত্তাকে তদ্ভাবে ভাবিত করিয়া সহজের সহিত একাত্ম করিয়া রাখাই পরমার্থ লাভ। ভাবের গীতের একটি পদে সুন্দরভাবে বলা হইয়াছে:

ভাইরে সহজ নিধির প্রত্যাশে যার লয়েছ আশ্রয়,
তেমন প্রাণের বন্ধু আর ঐ যে হয়না হবার নয়।
সেই বন্ধুর সঙ্গে আনন্দে পরম রঙ্গে
কুসঙ্গ করিয়ে ভঙ্গ ভাস ভাই প্রেম তরঙ্গে।

সর্বাস্ত হয়ে তার সনে হলে একাধার
অমনি অমিয় নিধি বাধ্যি হইবে তোমার
এমনি বন্ধুর সনে মিশবে যেন এক মরায় দুজন মর।

ভাইরে সহজ নিধি ধরিয়ে দিতে যার আকিঞ্চন।
সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে তোমার সেত ঐ যখন তখন।
স্মরণ মনন নিরীক্ষণ কর্ত্তে কর্ত্তে ভাই
তদ্ভাব প্রাপ্ত হবে তাহাতে সংশয় তো নাই।
তা হইলে হবে অগ্নি সহজ দেশে বাস
সহজ নিধির লাগাম পাবে পূরবে অভিলাষ
তখন হৃদ সরোজে সেই সহজে হেরবে নিরন্তর
যেন প্রাণ থাকিতে ভুলি না ভাই লালশশী রসিক বর। (পৃঃ ২৬/২য় ভাগ)

তিন

সাধনপদ্ধতি :

কর্তাভজাদের সাধনপদ্ধতি অতি সহজ সরল ; স্মরণ, মনন, ভজন কীর্তনই ইহাদের সাধনার বিধি। ঐতিহাসিক বিবর্তন ধারায় কর্তাভজা সম্প্রদায় সহজিয়া বাউল সম্প্রদায়ের সম্প্রসারিত রূপ। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই কর্তাভজাদের ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্যে বাউলদের সহিত ইহাদের রীতিমত সাদৃশ্য বিদ্যমান এবং সাধনপদ্ধতির ক্ষেত্রেও এই সাদৃশ্য অনেকখানি পরিমাণে লক্ষণীয়। অন্য দিকে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের উদ্ভব বাউলদের অনেক পরে। কালগত এই ব্যবধানের জন্যই হউক অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক সাধনপদ্ধতির ক্ষেত্রে বাউলদের অনেক পারিভাষিক শব্দ কর্তাভজাদের সঙ্গীত বা সাধনপদ্ধতির মধ্যে পাওয়া গেলেও সেগুলির প্রয়োগের বিস্তারিত নিদর্শন পাওয়া যায় না এবং অন্যদিকে কিছু নূতন নূতন রীতিরও প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এইখানেই কর্তভজা সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য।

(ক) অনুমান বর্তমান : রূপ স্বরূপ তত্ত্ব

মনের মানুষকে উপলব্ধির জন্য বাউলদের মধ্যে প্রচলিত সাধনপদ্ধতির নাম 'বর্তমান'। বাউলরা 'অনুমান' মানেন না, 'বর্তমান' লইয়াই তাঁহাদের কারবার। বাউলদের মতে 'অনুমান' বলিতে প্রচলিত শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান মূলক পদ্ধতি। সহজিয়াদের যে-প্রতিবাদী মনোভাবের কথা বলা হইয়াছে এই 'অনুমান' বিরোধীতা তাহারই অনুসিদ্ধান্ত। 'অনুমান' বিরোধীতা করিয়া তাহারা যে সাধনপদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে তাহার নাম 'বর্তমান'। দেহের মধ্যেই সমস্ত

তত্ত্ব বিদ্যমান, সেই তত্ত্বকে উপলব্ধির জন্য তান্ত্রিক যৌগিক কায় সাধনার প্রয়োজন। বিভিন্ন সহজিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে এই কায়-সাধনপদ্ধতি—রূপ-স্বরূপতত্ত্ব, এদেশ—সেদেশ তত্ত্ব, ইত্যাদি বিভিন্ন নামে প্রচলিত। বিভিন্ন প্রকার হেঁয়ালি ভাষার মধ্য দিয়া সেখানে যে মূল প্রক্রিয়াটির কথা বলা হইয়াছে তাহার সহিত তান্ত্রিক যৌগিক কায়সাধনার কোন পার্থক্য নাই। কায়সাধন পদ্ধতি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

"তন্ত্রে আমাদের দেহস্থিত মেরুদণ্ডটিকে মেরুপর্বত বলা হইয়াছে। এই মেরুপর্বতে সর্বনিম্নে অবস্থিত দক্ষিণমেরুতে মূলাধার চক্রে কুণ্ডলিনী অবস্থায় শক্তি (কুলকুণ্ডলিনী) নিদ্রিতা। তাহাকে জাগ্রত করিয়া উর্ধ্বমুখী করিয়া—স্বাধিষ্ঠান মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা ইত্যাদি বিভিন্নক্রমে মেরুপর্বতস্থ বিভিন্ন চক্রের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া সর্বোর্ধ্বে উত্তর মেরুতে সহস্রার পদ্মে অবস্থিত নিবৃত্তিরূপী শিবের সহিত মিলিত করিয়া দেওয়াই তান্ত্রিক সাধনার লক্ষ্য। * * দেহের বামদিকে অবস্থিত ইড়া ও দক্ষিণদিকে অবস্থিত পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয়কে যথাক্রমে শক্তি ও শিব, নারী ও পুরুষ হিসাবে ধরিয়া ইহাদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত প্রাণ অপান বায়ুকে দেহমধ্যস্থিত নাড়ী সুষুম্না পথে পরিচালিত করিয়া সহস্রারে প্রেরণ করিতে পারিলেই অদ্বয় সত্য লাভ হয় বলিয়া হঠযোগে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাই কায়সাধনপদ্ধতি—এই পদ্ধতিই তান্ত্রিকদের মধ্যে প্রচলিত"।[১]

সহজিয়াদের 'বর্তমান' সাধনা অর্থাৎ রূপ স্বরূপতত্ত্ব বা এদেশ ও সেদেশ তত্ত্ব মূলত ঐ তান্ত্রিক পদ্ধতির নামান্তর। মূলাধার ও সহস্রারই যথাক্রমে এদেশ ও সেদেশ অথবা রূপ স্বরূপ নামে উক্ত হইয়াছে। কর্তাভজাদের সঙ্গীতের মধ্যেও অনুমান পরিত্যাগ করিয়া বর্তমান সাধনার পথ গ্রহণের কথা বার বার বলা হইয়াছে :

বর্তমান সত্যজ্ঞান যথা সম্ভবে
অনুমান অনর্থক বৃথা হে ভবে
যাহার সহিত-হে আচার সর্বদায়
সেই সার প্রতিকার নিস্তার তথায়।

সজাতি এমতি গতি না হয়
রতি মতি নিবৃত্তি যথায়

আশ্রয় নিশ্চয় সে যে সহজ হবে
সদয় উদয় শশী রসিক যোগে॥ (পৃঃ ৪৬-৪৭/১ম ভাগ)

১. দ্র. চর্যাগীতি পরিচয়, সত্যব্রত দে, পৃঃ ৫১ [৩য় সং পৃঃ ৪৯]

অন্য একটি পদেও আছে :

যত তন্ত্র মন্ত্র ধ্যান জ্ঞান
সাধন মতে অনুমান
বর্তমান বিনা ত্রাণ
নাহিক সন্ধান। (পৃঃ ৪৫/১ম ভাগ)

আর একটি পদে আছে :

তুমি এদেশেতে ভঙ্গ দিয়ে সে রাজ্যেতে যাবে
সঙ্গ ছাড়া পথে দাঁড়াবে
তারা রঙ্গ দেখে তাড়াবে। (পৃঃ ১৬/১ম ভাগ)

এদেশ হইতে সেদেশে রূপ হইতে স্বরূপে উপস্থিত হইলে যে-সহজের উপলব্ধি হয় বাউলদের পরিভাষায় তাহার নাম 'অটল মানুষ'। কর্তাভজাদের অনেক পদে সেই অটল মানুষের কথা আছে :

ভাইরে স্বর্গমর্ত পাতাল চতুর্দশ ভুবন
এ সব খুঁজে অবাক হয়ে আছে যত জন
নয় অযোধ্যারি রাম নয় বৃন্দাবনের শ্যাম
সহজ থেকে বলছে ডেকে সহজ আমার নাম
সে যে অটল বিনে কদাচিৎ থাকে টলের কাছে। (পৃঃ ২২/২য় ভাগ)

(খ) যোগক্রিয়া-প্রসঙ্গ।

বাউলদের সহিত কর্তাভজাদের মূল পার্থক্য—যোগক্রিয়া বিষয়ে। বাউলদের ধর্মসাধনা মূলত মনের মানুষকে মনের মধ্যে উপলব্ধির সাধনা হইলেও বিস্তৃত তান্ত্রিক যৌগিক ক্রিয়াকাণ্ড ইহাদের অনেকের মধ্যেই বিদ্যমান। মূল বাউলদের মধ্যে নানা সম্প্রদায়ভেদ থাকিলেও প্রায় প্রতিটি সম্প্রদায়ের মধ্যে হঠ যৌগিক 'দমের কাজ,' 'যোগমিলন ক্রিয়া' বাণ ক্রিয়া বিভিন্ন মুদ্রা, চারিচন্দ্রভেদ প্রভৃতি সমেত রীতিমত সূক্ষ্ম জটিল ক্রিয়াকাণ্ডের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতি গ্রহণ ও প্রকৃতির সহিত মিলন ক্রিয়া ইহাদের অনেকেরই সাধনার অঙ্গ বিশেষ বলিয়া পরিগণিত। অবশ্য প্রকৃতি গ্রহণ ব্যাপারে নাথধর্ম রীতিমত ব্যতিক্রম। অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু যদিও সহজিয়াদের সহিত তান্ত্রিকতার সম্পর্ক অস্বীকার করিয়াছেন[১]—তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতি-যে বাউল তথা সমস্ত সহজিয়াদের সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ—এ সিদ্ধান্ত অন্য সকলেই স্বীকার করেন। পূর্ববর্তী বাউলদের

১. দ্র. মণীন্দ্রমোহন বসুর সহজিয়া সাহিত্য পৃঃ দশ আনা এবং Post Caitanya Sahajia Cult P. 66-75.

সহিত এই তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতিতেই কর্তাভজাদের পার্থক্য। কর্তাভজারা তাহাদের সঙ্গীতগুলির মধ্যে তান্ত্রিক পারিভাষিক শব্দ কিছু কিছু গ্রহণ করিলেও ইহাদের সাধনপদ্ধতিতে তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের প্রভাব খুবই কম। আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি ইহারা এদেশ সেদেশ তত্ত্ব, রূপ স্বরূপ তত্ত্ব, ইত্যাদির কথা ইহাদের সাধনসঙ্গীতের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন—কিন্তু বিস্তৃত কোন ক্রিয়া কর্মের উল্লেখ এই সঙ্গীতগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না। যোগক্রিয়া ইত্যাদি শব্দ ইহারা ব্যবহার করিয়াছেন কিন্তু যোগক্রিয়া বলিতে ইহারা বুঝান "একমনে শুদ্ধচিতে শ্রীগুরুর পদধ্যান ও মহাশক্তি সম্পন্ন শ্রীনাম শ্বাসে শ্বাসে স্মরণ" অর্থাৎ পারিভাষিক শব্দগুলি কেবলমাত্র যেন ঐতিহ্যের স্মৃতি বহন করিতেছে। শুধু সাধনসঙ্গীতের মধ্যেই যে তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কিত উল্লেখের স্বল্পতা তাহাই নহে ঐ সম্প্রদায়ের ভক্ত সাধারণও এই তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠানের কথা বিশেষ কিছু জানে না। যোগমিলন ক্রিয়া সম্পর্কেও ইহাদের নিষেধ তীব্র —"মেয়ে হিজড়ে পুরুষ খোজা—তবে হবে কর্তাভজা"। প্রকৃতি সাহচর্য সম্পর্কেও ইহারা রীতিমত বিধিনিষেধে বিশ্বাসী। অবশ্য প্রবৃত্তি দমন মূলক ব্রহ্মচর্য সাধনাও ইহাদের নহে। সহজ সরল স্মরণ মনন, ভজন কীর্তনের ইহারা পক্ষপাতী। কঠিন ইন্দ্রিয়দমন ইত্যাদি কৃচ্ছসাধন, অথবা জটিল আচার অনুষ্ঠানের ইহারা ধার ধারেন না। দিবসের মধ্যে পাঁচ বার ইহারা ইষ্টনাম স্মরণ করেন এবং শুক্রবারে অথবা বিশেষ বিশেষ তিথিতে বৈঠক করিয়া ভজন কীর্তন করেন। এই সমস্ত বৈঠকে কোন পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। নিজেরাই ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করেন। ইহাদের একটি সঙ্গীত আছে :

দেহেন্দ্রিওগণ করি সুপালন
মন একাধারে রাখিয়া মিলন
রাগানুগা আজ্ঞা সেবা হবে সদা সচেতন। (পৃঃ ২৩/১ম ভাগ)

ইন্দ্রিয়ানুগ স্বাভাবিক জীবন যাপন, 'সত্য' শরণ ও গুরুপদ সেবনই ইহাদের সাধনা।[১]

(গ) নামমহিমা : কীর্তন ও ভজন।

নৃত্য ও সঙ্গীত সহযোগে সাধনা বাউল ও সুফী ধর্মের বৈশিষ্ট্য। কর্তা-

১. কর্তাভজারা সহজিয়া—সুতরাং তাঁদের মধ্যে কায়-সাধনার কিছু কিছু অনুষ্ঠান থাকা স্বাভাবিক। তবে পূর্ণাঙ্গ তান্ত্রিক সাধনা বলতে যা বোঝায় তা কর্তাভজা ধর্মে কোনো কালে ছিল বলে মনে হয় না। ভাবের গীতে কায়সাধনা বা তান্ত্রিকতার ইঙ্গিত স্বল্প-এর কারণ এদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানের প্রচলন কম তাই নয়—গোপনীয়তার জন্যেও হয়ত উল্লেখের স্বল্পতা। হয়ত এদের খুব অন্তরঙ্গ মহলে অল্পস্বল্প এই সাধনার প্রচলন ছিল এবং/অথবা কেউ কেউ ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার নামে এই অনুষ্ঠানের সুযোগ গ্রহণ করেছেন এবং তা পরবর্তীকালে।—সম্পাদক

ভজাদের মধ্যে নৃত্যের তেমন প্রচলন নাই, অন্তত আধুনিককালে ইহার কোন চিহ্ন বর্তমান নাই। তবে সঙ্গীত সহযোগে সাধনা কর্তাভজাদের মধ্যেও প্রচলিত। এই সঙ্গীত—শ্রীশ্রীযুতের পদ এবং সাধারণ হরিনাম ভজন ও কীর্তন। চৈতন্যপ্রভাবিত নাম কীর্তনের মহিমাতেও ইহাদের একান্ত বিশ্বাস :

নাম রস গানেতে মত্ত যার রসনা
অবিলম্বে স্বয়ং ব্রহ্ম যিনি
(ও ভাই) তারে করেন করুণা.
থাকেনা ভাই কোন যন্ত্রণা
অন্তকাণ্ড গরল ভক্ষণ
নাম রস পানেতে রে ভাই খণ্ডে ততক্ষণ
আর দিবা নিশি অবিরত চাইত ঘোষণা
দেখ ভাব ভক্তি পদার্থ প্রেম যাহাতে
তুলনা হবে নারে ভাই নামের সাথে
নিস্তির ওজন ত্রিগুণধারী
সকলের অপেক্ষারে ভাই নাম বড় ভারী
আর ভেবে দেখ নাম ধরে
ডেকে কেন যাচনা। (পৃঃ ২/২য় ভাগ)

এই নামরস মূলত হরি নামের রস হইলেও অন্যান্য নানা দেবদেবীর নামও কর্তাভজারা কীর্তন করেন। রামনাম, কালীনাম, শিবনামের মহিমা জ্ঞাপক সঙ্গীতেরও অভাব নাই ভাবের গীতের মধ্যে। যেমন অবস্থাতেই থাক দিনান্তে একবার অন্তত নাম কর ইহাই ভক্তদের প্রতি উপদেশ :

শুদ্ধাচারী হতে তোমরা পার না পার।
দিন গেলে ক্ষণেক বদনে হরিনাম কর॥ (পৃঃ১১/২য় ভাগ)

(ঘ) অন্যান্য আচরণীয় বিধি নিষেধ :

(১) অনাড়ম্বর জীবন যাপন ও সদাচার পালন।

কর্তাভজারা প্রধানত গৃহী সাধক। বাউলদের সহিত এ বিষয়েও তাঁহাদের কিছু পার্থক্য লক্ষণীয়। বাউলদের মধ্যে গৃহী বাউলের সংখ্যা নিতান্ত কম না হইলেও বাউল বলিতে সাধারণত গৃহ বিবাগীই বুঝায়। কর্তাভজারা প্রধানত গৃহী বলিয়া তাহাদের সাধনপদ্ধতিও গৃহীদের উপযোগী। স্বাভাবিক জীবন-যাপন প্রণালীকে ব্যাহত না করিয়া এবং গৃহাশ্রমকে রক্ষা করিয়া এই ধর্মের সাধনা। এই ধর্মের উদ্দেশ্যই যেন ছিল জীবনকে স্বাভাবিক রাখা—অর্থাৎ প্রবৃত্তি দমন করিয়া জীবনকে শুষ্ক করিয়া ফেলা এই ধর্মের লক্ষ্য নহে, অন্যদিকে প্রবৃত্তির অনিরুদ্ধ বেগকে প্রশ্রয় দেওয়াও ইহাদের নীতি নহে। জীবনের

সীমাহীন ভোগ আকাংখাকে কিঞ্চিৎ নিরুদ্ধ করিয়া জীবন যাত্রার মধ্যে শান্ত সংযত মহিমা বিস্তার করা ছিল কর্তাভজাদের লক্ষ্য। এই ধর্মের আচরণীয় বিধি নিষেধ তাই একান্তই জটিলতা মুক্ত। আউলচাঁদ সর্বদা মুখে বলিতেন 'সত্য বল'—অর্থাৎ সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরের নাম গ্রহণ কর। পরবর্তীরা এই 'সত্য বল'র সহিত যুক্ত করিলেন "গুরু ধরো সঙ্গে চলো," অর্থাৎ—ঈশ্বরের নাম কর, গুরু ভজনা কর, এবং গুরুর উপদেশ নির্দেশ মত চলো 'সত্য বলো'—বাণীর অর্থ মূলত ছিল ঈশ্বরের নাম কর—কারণ কর্তাভজাদের মতে ঈশ্বরের নামই সত্য —এই ধর্মের অপর নাম তাই 'সত্যধর্ম'। কিন্তু পরবর্তী কালে 'সত্য' আক্ষরিক অর্থে গৃহীত হইয়াছে—এবং সত্য কথা বলা ইঁহাদের জীবনের প্রধানতম আচরণীয় শীল হিসাবে গণ্য হইয়াছে। এই সম্প্রাদায়ের আচার আচরণীয় সম্পর্কে ডাঃ ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 'শ্রীশ্রীযুতের পদের' মুখ বন্ধনে লিখিয়াছেন :

"কুলগুরু ত্যাগ করিতে হয় না কারণ ইহাদের দ্বারা ভক্তির (devotion) ও বহু সদুপদেশ শিক্ষা পাওয়া যায়। এ মতে ইন্দ্রিয় দোষ ভুয়ো ভুয়ো নিষিদ্ধ। ইহার একটি বচন যথা, মেয়ে হিজড়ে পুরুষ খোজা তবে হবে কর্তাভজা। মদ্য মাংস ও ডিম্ব গ্রহণ ও অযথা গমন ও উচ্ছিষ্ট ভোজন বিশেষরূপে নিষিদ্ধ, মিথ্যা কহা, চুরিকরা হিংসাদ্বেষ নিন্দা কথন মনে মনেও অপরের অনিষ্ট চিন্তা ও অনর্থক বাক্য ব্যয় করা নিষিদ্ধ। মৎস্য খাওয়া নিষিদ্ধ কিন্তু অপারক পক্ষে শুক্রবার দিবারাত্র মধ্যে মৎস্য খাওয়া নিষিদ্ধ, স্ত্রী পুরুষে একত্রে উপবেশন বা নির্জনে কথা কহা নিষিদ্ধ, কিন্তু যদ্যপি উভয়ে রিপুদমন করতে পারক হন তবে বসিতে পারেন ; ইহা অতি বিরল।" (পৃঃ ৫)। সত্যস্রোত নামক গ্রন্থেও উল্লিখিত আছে—"ইহাদের নিষেধ যথা মিথ্যাকথা বলা, পরদার গমন, মদ্যপান, মাংস ও উচ্ছিষ্ট ভোজন, ও পঞ্চ আজ্ঞা আছে যথা—ভয় ভক্তি সেবা বিশ্বাস ও আনুকূল্য।" (পৃঃ ২১)[১]

সামাজিক আচার অনুষ্ঠান বিষয়ে ইঁহাদের মধ্যে বিশেষ কোন বিধি নিষেধ নাই। কুলপ্রথা রক্ষায়, প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি অনুসরণে এবং পূজার্চনায়ও কোন বিধি নিষেধ নাই। প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ রুচি বিশ্বাস অনুযায়ী বিধি নিষেধ মানিয়া চলেন। এই উদারতা ইঁহাদের সরলতাও

১. ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় গ্রন্থে অক্ষয়কুমার এই সম্প্রদায়ীদের দশটি নিষিদ্ধ কর্মের উল্লেখ করেছেন :

তিন কায়কর্ম : পরস্ত্রীগমন, পরদ্রব্য হরণ ও পরহত্যা করণ।

তিন মনঃকর্ম : পরস্ত্রী গমনের ইচ্ছা, পরদ্রব্য হরণের ইচ্ছা ও পরহত্যা করণের ইচ্ছা।

চারি বাক্য কর্ম : মিথ্যাকথন, কটুকথন, অনর্থক বচন ও প্রলাপবচন। পৃঃ ১২২।

—সম্পাদক

সূচিত করে। আড়ম্বরহীন সরলতার ভিতর দিয়া কতকগুলি সুনীতি ও সদাচার অনুসরণ করিয়া জীবনকে স্নিগ্ধ শান্ত সুন্দর করিয়া তোলাই ইহাদের লক্ষ্য।

(২) শুক্রবারের বৈঠক।

পূর্বোক্ত অনাড়ম্বর জীবনযাপন ও সুনীতি সদাচার মানিয়া চলা ছাড়া কর্তাভজাদের ধর্মীয় সাধনপদ্ধতির মধ্যে প্রতিদিন পাঁচবার নাম স্মরণই একমাত্র অনুষ্ঠান। ইহাছাড়া 'শুক্রবার পালন' ইহাদের আর একটি অনুষ্ঠান। কর্তাভজাদের মতে শুক্রবার দিনটি বিশেষ পবিত্র। কেন যে শুক্রবারই বিশেষ পবিত্র দিন বলিয়া গৃহীত হইল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সম্প্রদায়ীদের মধ্যে জনশ্রুতি এই যে আউলচাঁদ প্রভু প্রথম যে দিন বরজ মধ্যে আবির্ভূত হন সেদিন ছিল শুক্রবার। শুক্রবারকে পবিত্র দিন হিসাবে নির্বাচনে ইসলামী প্রভাব থাকা অসম্ভব নহে। কিম্বা হয়তো হিন্দু মুসলমানের সমন্বয়সাধন এই ধর্মমত প্রবর্তনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া কিছু কিছু ইসলামী আচার আচরণ ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট করান হইয়াছে [প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য]। যাহা হউক, এই শুক্রবার পালনের বিধানও খুব সরল। যথাসম্ভব সংযমী ও পবিত্রভাবে থাকিয়া সন্ধ্যায় ঠাকুরের উদ্দেশ্যে পবিত্রস্থানে একটি আসন স্থাপন করিতে হয় এবং সিরনি ভোগের ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহাতে কোন প্রতিমা, তিলকমালা, পূজোপকরণ এমনকি পুরোহিতেরও প্রয়োজন হয় না। উপস্থিত ভক্তগণ অন্তরে ঠাকুরের নাম স্মরণ ও ধ্যান করেন। পরে শ্রীশ্রীযুতের পদ বা অন্য কোন কীর্তন জাতীয় সঙ্গীতাদি হয়। সম্প্রদায়ী ব্যতীত অন্য কাহারও সামনে নামকীর্তন বা ধর্মতত্ত্বের আলোচনা হয় না—অর্থাৎ কিছু গোপনীয়তা পালনের বিধিও আছে। এই সমগ্র অনুষ্ঠানটি শুক্রবারের বৈঠক নামেও অভিহিত হয়। সম্ভব হইলে প্রতি শুক্রবার অন্যথায় বিশেষ বিশেষ শুক্রবারে এই বৈঠক করা বিধেয়।

(৩) জাতিভেদ প্রথা অস্বীকার।

বিভিন্ন উৎসবাদিতে বিশেষ করিয়া দোলমেলা উপলক্ষে ঘোষপাড়া ঠাকুর বাড়িতে উপস্থিতি কর্তাভজাদের অন্যতম পুণ্যকর্ম বলিয়া বিবেচিত। এই মেলা উপলক্ষে ইহাদের মধ্যে কিছু অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যায়। ইহারা, অন্তত ঘোষপাড়া মেলাতে, জাতিভেদ প্রথা স্বীকার করেন না। পূর্বে আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি—এই মতের প্রবর্তক একজন মুসলমান বা অজ্ঞাত-কুলশীল হিন্দু। এই সম্প্রদায়ীদের প্রথম গুরু সদোগাপ জাতীয় রামশরণ পাল। সুতরাং ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য অভিমানের কোন সুযোগ ছিল না। অব্রাহ্মণের গুরু হইবার অধিকার সম্ভবত একমাত্র ইহাদের মধ্যে প্রচলিত। বহু অব্রাহ্মণ 'মহাশয়ের' ব্রাহ্মণ 'বরাতি'র সন্ধান পাওয়া যায়। তাহাছাড়া প্রথম প্রবর্তনের সময়কার সমন্বয়ী মনোভাবও জাতিভেদ প্রথা অস্বীকার করিবার মূলে প্রেরণা

জোগাইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক এই ।বভেদপীড়িত দেশে জাতিভেদ প্রথা লোপ করিবার সংকল্পও অভিনবত্ব দাবী করিতে পারে। অবশ্য কর্তাভজারা সাধারণ সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে সর্বদা জাতিভেদ প্রথাকে একেবারে উপেক্ষা করিতে পারেন না। তবে ঘোষপাড়া শ্রীক্ষেত্রে ইঁহাদের সবজাতি একাকার—ব্রাহ্মণ বৈশ্য হিন্দু মুসলমানে কোন ভেদ বিভেদ নাই। সকলেই ঠাকুরবাড়ি হইতে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করেন। যাঁহারাই কর্তাভজাদের সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাই জাতিভেদ প্রথা অস্বীকারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। উইলসন সাহেব লিখিয়াছেন :

"The distinction of caste is not acknowledged amongst the followers of the sect······they eat together······once or twice a year" নবীনচন্দ্র সেনও লিখিয়াছেন : "ঘোষপাড়ায় জাতিভেদ নাই।" ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন : "এই সম্প্রাদায়ের মধ্যে কোন জাতিভেদ ছিল না। এই সদ্গোপ মহান্তের হিন্দু-মুসলমান শিষ্যেরা একসঙ্গে আহারাদি করিত।"

কর্তাভজাদের সাধনসঙ্গীতে এই ভেদবিভেদহীন সমদৃষ্টির কথা একাধিকবার উল্লিখিত আছে :

ভেদ নাই মানুষে মানুষে খেদ কেন ভাই এদেশে
দেখহ সহজে স্বভাবে বুঝে। (পৃঃ ৪২/১ম ভাগ)

আর একটি সঙ্গীতেও আছে :

আছে মানুষে মানুষে যার ভেদ জ্ঞান
সে রাজ্যে গমনে তার মিলবে না সন্ধান। (পৃঃ ৩৬৭/২য় ভাগ)

এই জাতীয় উক্তি বহু পদেই আছে। এই ভেদ বিভেদহীনতা শুধু যে উদারতারই পরিচায়ক তাহা নহে ইহা কর্তাভজাদের বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং যুগোপযোগী মনোভাবেরও পরিচয় বহন করে।

চতুর্থ অধ্যায়

বিবিধ প্রসঙ্গ

(ক) ঠাকুর বংশ

ঘোষপাড়া ঠাকুর বংশ বলিতে রামশরণ পাল ও তাঁহার বংশধরদের বুঝাইয়া থাকে। বংশানুক্রমিক ভাবে ইহারাই কর্তা। অবশ্য রামশরণ পাল এবং তাঁহার স্ত্রী সতীমাতার যে অলৌকিক শক্তি ছিল পরবর্তীদের মধ্যে তাহা নাই। রামশরণের পর পুত্র রামদুলালের মধ্যেও শক্তি অনেকখানি ছিল এবং তাঁহার সময়েই এই সম্প্রদায় ও ধর্মমত সর্বাপেক্ষা বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। রামদুলালের পাঁচ পুত্রের মধ্যে চতুর্থ ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যেও যোগ্যতা কিছু পরিমাণে ছিল। তাঁহার সময়ে তিনিই কর্তা ছিলেন এবং ভক্তদের মধ্যে ন'বাবু রূপে অভিহিত হইতেন। ইহাদের সম্পর্কে কিছু আলোচনা পূর্ববর্তী প্রবর্তক প্রচারক অধ্যায়ে করা হইয়াছে। বস্তুত কর্তাভজা ধর্ম প্রসঙ্গে ঠাকুর বংশের আলোচনার সীমারেখা এই পর্যন্তই হওয়া উচিত। তবুও ভক্ত সাধারণের বিশ্বাসে যেহেতু ঠাকুর বংশের উত্তরাধিকারীরা শুধু সম্পত্তির নহে শক্তিরও উত্তরাধিকারী বলিয়া বিবেচিত হন সেইহেতু তাঁহাদের কৌতূহল নিবারণার্থে এবং সাধারণ পাঠকের অবগতির জন্য ঠাকুর বংশের পরিণতির ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃতি করা হইতেছে।

ঈশ্বরচন্দ্রের সমসাময়িক কালে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা—ইন্দ্রনারায়ণও কর্তা বলিয়া—অভিহিত হইতেন এবং ভক্তদের মধ্যে ছোটবাবু নামে পরিচিত ছিলেন। কর্তাভজা ধর্ম গৃহীসাধকদের ধর্ম এবং প্রথম কর্তা রামশরণ পালও গৃহী ছিলেন। কিন্তু সাংসারিকতা বলিতে যাহা বুঝায়—ঈশ্বরচন্দ্র, ইন্দ্রনারায়ণের সময় হইতেই তাহা পূর্ণমাত্রায় ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে। রামদুলালের মৃত্যুর সময় তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে তিন জন জীবিত ছিলেন। দুই জনের উল্লেখ ইতিপূর্বেই করা হইয়াছে—তৃতীয় জন কুঞ্জবিহারী। ইনি পিতার জীবিতকালে তাঁহার সহিত রাগারাগি করিয়া গৃহত্যাগ করেন। পিতার মৃত্যুর পর ফিরিয়া আসিয়া অন্য দুই জীবিত ভ্রাতার মত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের উত্তরাধিকারী হন। কিন্তু পুত্রহীন অবস্থায় দেহত্যাগ করেন বলিয়া ইহার অংশের উত্তরাধিকারী হন তাঁহার মৃত্যুকালে জীবিত ভ্রাতুষ্পুত্র সত্যচরণ (ইন্দ্রনারায়ণের পুত্র)। ইন্দ্রনারায়ণের দুই পুত্র—রসিকলাল ও সত্যচরণ। রসিকলাল পিতার সম্পত্তির অর্ধেকের উত্তরাধিকারী হন। সত্যচরণ পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত অংশের সহিত পূর্ববর্ণিত পিতৃব্যের অংশের উত্তরাধিকারী

হইয়া—ঠাকুরবাড়ির মূল সম্পত্তির অর্ধেকের উত্তরাধিকারী হন। অন্যদিকে—ঈশ্বরচন্দ্রের তরফ ঠাকুরবাড়ির তৃতীয় শরীক। বর্তমানে ঠাকুরবাড়ির তিন শরিক বলিতে—ঈশ্বরচন্দ্রের তরফ এবং ইন্দ্রনারায়ণের দুই পুত্র—রসিকলাল ও সত্যচরণের তরফকেই বুঝায়।[১]

ঈশ্বরচন্দ্রের অংশে বর্তমানে তাঁহার বংশের কেহ আর কর্তা নহেন। ঈশ্বরচন্দ্রের দুই পুত্র পিতৃবর্তমানে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায়—তাঁহার দুই পৌত্র হরিদাস এবং শৈলেশ্বর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। পরে অবস্থাগতিকে দুই অংশ আবার এক হইয়া যায় এবং হরিদাসের স্ত্রী সরস্বতী দাসী সম্পত্তির উত্তরাধিকারী থাকাকালে তিনি ট্রাষ্টডীড করিয়া সমস্ত সম্পত্তি ঠাকুরবাড়ির নামে সমর্পণ করেন। এই ট্রাষ্টীরাই—বর্তমানে ঈশ্বরচন্দ্রের তরফে কর্তাগিরি করেন। অন্যদিকে ইন্দ্রনারায়ণের অধস্তন পুরুষেরা যদিও অন্য দুই অংশের বংশানুক্রমিক 'কর্তা'—তবুও তাঁহারা শিক্ষায় দীক্ষায় সম্পূর্ণ আধুনিক—অনেকেই চাকুরী ব্যবসায় ইত্যাদিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। অর্থাৎ পরবর্তী ইতিহাস জমিদারীর ইতিহাস—মামলা মোকর্দমা ইত্যাদির বিবরণও ইহার মধ্যে যথেষ্ট আছে। বংশের সকলেই অবশ্য পাল উপাধির সহিত 'দেবমহন্ত' উপাধিও ব্যবহার করেন—কিন্তু 'কর্তাগিরি'—যে কোন একজনই করেন ; এ কর্তাগিরি নিতান্তই বাস্তব অর্থে।

(খ) ঘোষপাড়া

কর্তাভজা সম্প্রদায়ের নিকট ঘোষপাড়া একটি পুণ্যতীর্থ। প্রতি বৎসর দোল মহোৎসব এবং অন্যান্য বিভিন্ন উপলক্ষে বহুযাত্রী এখানে সমবেত হন। রামশরণ পালের বাসস্থান এবং ফকির ঠাকুরের আখড়া স্থাপনের জন্যই মূলত ঘোষপাড়ায় মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে আরও অনেক মন্দির সমাধি ইত্যাদি স্থাপিত হওয়ায় ইহার গৌরব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। রামশরণ পাল যে কিসের আকর্ষণে পিতৃ সংসার পরিত্যাগ করিয়া জঙ্গলাকীর্ণ ক্ষুদ্র নির্জন পল্লী ঘোষপাড়াতে আপন বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং কেনই বা ফকির ঠাকুর এখানে তাঁহার আখড়া স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। তবে মূলত-যে তাঁহাদের জন্যই সেই নির্জন পল্লী ঘোষপাড়ার বিপুল পরিবর্তন ও উন্নতি সাধিত হইয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রথমত ঘোষপাড়াতে লোকালয় বলিতে বিশেষ কিছু ছিল না। কিন্তু ফকির ঠাকুরের মহিমা প্রচারিত হইবার সাথে সাথে অনেক লোক স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে এখানে আসিয়া বসবাস করিতে শুরু

১. ঈশ্বরচন্দ্র, ইন্দ্রনারায়ণের জীবৎকালে, মনেহয়, ঠাকুরবাড়ির একটিই গদি ছিল এবং মূল কর্তা ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। ইন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর ঈশ্বরচন্দ্রের জীবিতাবস্থায়—ইন্দ্রনারায়ণের দুই পুত্র রসিকলাল ও সত্যচরণ পৃথক গদি স্থাপন করেন। পরে অবশ্য এঁরাও পৃথক হয়ে যান—দুই তরফে পৃথক গদি স্থাপিত হয়।—সম্পাদক

করেন। ঘোষপাড়ার প্রথম পরিবর্তন ঘটে জঙ্গলের পরিবর্তে আম্রকুঞ্জ এবং লিচু বাগান স্থাপনে। লোকালয় এবং জলাশয়ের সংখ্যাও বাড়িতে থাকে।

ইংরাজ রাজত্বকালে এই ঘোষপাড়া ছিল নদীয়া জেলার রানাঘাট মহকুমার চাকদহ থানা এবং হাবেলী শহর পরগণার অন্তর্গত, কিন্তু ডাক বিভাগ মতে এই গ্রাম ঘোষপাড়া ছিল ২৪ পরগণা জেলার কাঁচড়াপাড়া ডাকঘরের এলাকাধীন। (তৎকালীন ই. বি. রেলওয়ের) কাঁচড়াপাড়া স্টেশন ঘোষপাড়ার দুই তিন মাইলের মধ্যেই; মধ্যবর্তী পথটি—পাকা। বর্তমানে ঘোষপাড়া নব নির্মিত কল্যাণী শহরের অংশ বিশেষ Block E এবং F. Block ABCD-র উন্নতি সাধিত হইলে Block E এবং F এর কাজ সুরু হইবে। তখন ঘোষপাড়ার কী অবস্থা দাঁড়াইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। বর্তমানে ঘোষপাড়া কল্যাণী থানা এবং কল্যাণী ডাকঘরের অধীন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য নবনির্মিত হরিণঘাটা দুগ্ধকেন্দ্র ঘোষপাড়ার অতি নিকটে।

ঘোষপাড়াতে যাতায়াতের ব্যবস্থা বেশ সুবিধাজনক। কাঁচড়াপাড়া ও নবসৃষ্ট কল্যাণী রেলস্টেশন হইতে ঘোষপাড়ায় আসিতে রিকশা এবং কখনও বা ট্যাকসি পাওয়া যায়। দোলের সময় বহু বাসেরও ব্যবস্থা থাকে। কলিকাতা হইতে কল্যাণী পর্যন্তও বাস চলে। ইংরাজ আমলে কলিকাতা হইতে ঘোষপাড়া পর্যন্ত একটানা একটি প্রশস্ত পথ নির্মিত হইয়াছিল—ঐ রাস্তার নাম ঘোষপাড়া রোড। বারাকপুর নৈহাটি কল্যাণীর মধ্যদিয়া ঐ রাস্তা প্রসারিত। গঙ্গানদী বাহিয়া নৌকাতেও ঘোষপাড়ায় আসা যাওয়া করা যায়। আগে ষ্টীমারও চলিত।

(গ) ঘোষপাড়া ঠাকুরবাড়ি

ঘোষপাড়ার প্রধান আকর্ষণ এখানকার ঠাকুরবাড়ি। ঠাকুরবাড়ি বলিতে বুঝায় কর্তামায়ের বাড়ি, তাঁহার সমাধি, এবং তাঁহার বংশধরগণের বাসস্থান। একখণ্ড বিস্তৃত জমির উপর অবস্থিত সেকালের ধরণের এবং মধ্যম আকারের একটি বাড়িই ঠাকুরবাড়ি। পূর্ব হইতেই এই বাড়িতে তিনটি মহালে বিভক্ত ছিল—অন্দর, মধ্য ও বহির্বাটী।

অন্দর বাটী সমগ্র ঠাকুরবাড়ির উত্তর পূর্ব অংশে অবস্থিত। ইহাতে আছে রামশরণের অধস্তন পুরুষদের বসত বাড়ি। সবগুলি বাড়িই পাকা—কতকগুলি দোতলা—কতকগুলি একতলা।

মধ্য বাটীতে আছে কর্তামায়ের সমাধি মন্দির, সত্যচরণ ও গোপালকৃষ্ণ বাবুর এবং হরিদাস বাবুর পত্নী সরস্বতী দাসীর সমাজ ঘর। শ্রীশ্রীদুলেব, ঈশ্বর বাবুর এবং শৈলেশ্বর বাবুর ঘর, কালীকৃষ্ণ বাবুদের বৈঠকখানা ঘর, ট্রাষ্ট এষ্টেটের গদীঘর এবং স্বল্প বিস্তৃত অবিভক্ত উঠান ও তুলসী মঞ্চ।

বহিরবাটিতে আছে প্রসিদ্ধ ডালিম গাছ, গৃহদেব সত্যনারায়ণ ও বিষ্ণুর মন্দির, পূজার দালান, রাসমঞ্চ, রসিকবাবু ও সুরেন্দ্র বাবুর সমাজ ঘর, ট্রাষ্টী এষ্টেটের নূতন ঘর এবং বিস্তৃত উঠান। উহার দক্ষিণ দিকে সদর গেট, পশ্চিমদিকে আর একটি গেট এবং পূর্বপার্শ্বে বিস্তৃত খোলা জায়গা--নাম হাতীশালা। ইহার অনতিদূরে পবিত্র হিমসাগর; সেখানে যাইতে হয় সদর গেটের মধ্যদিয়া। সদর গেটটি পূর্বে খুব বড় আকারের ছিল এবং উহার উপরে নহবৎখানা ছিল। পরে উহা জীর্ণ হইলে সত্যধর্ম সেবক সংঘের প্রচেষ্টায় কিছু ছোট আকারে উহা পুনর্নির্মিত হইয়াছে। পশ্চিম গেটের সম্মুখে একটি বড় পুকুর—নাম বেনে পুকুর। অন্দর মহলের পূর্ব দিকেও একটি ছোট পুকুর আছে। খিড়কির পুকুর নামে উহা পরিচিত। পুকুরগুলির অবস্থা এখন শোচনীয়।

(ঘ) বিবিধ দর্শনীয় স্থান

(১) সতীমায়ের মন্দির :—ভক্তজনের কাছে ঘোষপাড়ায় সর্বাপেক্ষা বেশী আকর্ষণীয় বস্তু সতীমায়ের মন্দির অর্থাৎ কর্তামাতার সমাধি। কর্তামাতার নির্দেশমত তাঁহার পৌত্রদ্বয় ঈশ্বরচন্দ্র এবং ইন্দ্রনারায়ণ এবং অন্যান্য শিষ্য ও ভক্তগণ তাঁহার বাটীর একাংশেই তাঁহাকে সমাধিস্থ করেন। ভক্তগণের মধ্যে জনশ্রুতি এই যে কর্তামাতা মৃত্যুকালে বলিয়াছিলেন যে তাহাকে যেন বাটীর একাংশে সমাধিস্থ করা হয়—তাহা হইলে তিনি সর্বদা ঠাকুর বাটীতে থাকিয়া ফকির ঠাকুরের নির্দেশমত ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারিবেন। আবরণের উদ্দেশ্যে প্রথমে সমাধির উপর সামান্য একখানি খড়ের ঘর নির্মাণ করা হইয়াছিল। কিছুকাল পরে (আনুমানিক ১২৬০ সালে) ভক্তবৃন্দের চেষ্টায় ও অর্থে একটি পাকা ঘর (সাধারণ বাসগৃহের মত একটি ঘর) নির্মিত হইয়াছে। দৃশ্যত ইহা মন্দিরের মত বা আদৌ আকর্ষণীয় নহে। কুটীরের ভিতরে মূল সমাধিস্থানটি ইষ্টকদ্বারা দেবী আকারে গ্রথিত ছিল। পরে আনুমানিক ১৩৩০।৩২ বঙ্গাব্দে স্বর্গীয় হরিদাস বাবুর স্ত্রী সরস্বতী দাসী ঐ বেদীর উপরিভাগ মর্ম্মর প্রস্তরে আচ্ছাদিত করিয়া দিয়াছিলেন। মন্দিরগৃহটি বর্তমানে জীর্ণদশা প্রাপ্ত। কর্তা-মাতা জীবিতকালেই দেবী বলিয়া পূজিত ছিলেন বলিয়া আজ পর্যন্ত তাঁহার সমাধিস্থলে নিত্যপূজা ভোগাদির ব্যবস্থা হইয়া থাকে। বর্তমানে তিন শরিক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পূজার আয়োজন করেন। সমাগত ভক্তবৃন্দও পূজা প্রণামী ও মানৎ ইত্যাদি নিবেদন করিয়া থাকেন।

(২) সমাজ ঘর :—ঘোষপাড়াতে কর্তামায়ের সমাধিটিই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ সমাধি—ইহা ছাড়া বাকী যেগুলি আছে সেগুলি অনুকল্প সমাধি; তাহাদের নাম সমাজ ঘর। এগুলি যাঁহাদের সমাধি তাঁহাদের দেহ অন্যত্র সংকার করিয়া অস্থি ইত্যাদি আনিয়া এখানে সমাধিস্থ করা হইয়াছে। এরূপ সমাজঘর

ঘোষপাড়াতে বেশ কয়েকটি আছে। এই স্থানগুলিও পবিত্রস্থান বলিয়া বিবেচিত এবং এই সমস্ত স্থানেও নিত্যপূজা ও ভোগাদির ব্যবস্থা করা হয়। সমাগত ভক্তবৃন্দও প্রণামী নিবেদন করিয়া থাকেন।

( ) শ্রীশ্রীযুতের ঘর —রামশরণের একমাত্র পুত্র রামদুলাল বা দুলালচাঁদের পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। দুলালচাঁদ জীবিতকালে যেখানে বাস করিতেন পরে সেখানে একখানি পাকা গৃহ নির্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং গৃহমধ্যে তাঁহার উদ্দেশ্যে শয্যাদি রক্ষিত আছে। এই গৃহটি সতীমায়ের মন্দিরের পূর্বদিকে অবস্থিত এবং একটি পবিত্র স্থান বলিয়া বিবেচিত।

(৪.৫) সতীমায়ের পালিত পুত্র বাঁকাচাঁদ এবং কন্যা ভগবতী ওরফে রক্ষাকালী দেবীও ভক্তের দৃষ্টিতে—সতীমায়ের শক্তির অধিকারী। ইহাদের বাসস্থান —বাঁকাচাঁদের ঘর, রক্ষাকালী মায়ের বাড়িও পবিত্র স্থান বলিয়া বিবেচিত।

(৬) ডালিমতলা :—ঘোষপাড়ার আর একটি বিশেষ পবিত্র স্থান ডালিমতলা। ফকির ঠাকুর ইহার নিচে বসিয়া জপতপ করিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এখানে আর্তপীড়িতের মনোবাসনা পূর্ণ হয় বলিয়া দোলমেলা উপলক্ষে সমাগত শত শত ভক্ত— বিশেষ করিয়া যাহারা বোবা, কালা ইত্যাদি দৈহিক দিকে বিকৃত বিকলাঙ্গ তাহারা হিমসাগরে স্নান করিয়া দণ্ডি খাটিয়া এই ডালিমতলায় আসিয়া ধর্ণা দেয়। ডালিমতলার ধুলিও অতি পবিত্র বলিয়া—ভক্তগণ সাথে করিয়া লইয়া যায়। গাছটি ফকির ঠাকুরের আমল হইতে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস। বস্তুত অন্যান্য বহু তীর্থ ক্ষেত্রের নানা বৃক্ষ সম্পর্কে যেরূপ জনশ্রুতি এটি সম্পর্কেও তাই :—মূল বৃক্ষটি মরণোন্মুখ হইলে —নূতন শাখা প্রকাশিত হইয়া গাছটিকে দীর্ঘজীবী করিয়াছে। সে যাই হোক, ঘোষপাড়ার মাহাত্ম্যের অন্যতম মুখ্য উপাদান যে এই ডালিমতলা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বর্তমানে ডালিম গাছের গোড়াটি শ্বেতপ্রস্তর দ্বারা বেদীর আকারে বাঁধান এবং চারিপাশ রেলিং দ্বারা ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছে।[১]

(৭) হিমসাগর :—ঘোষপাড়ার আর একটি পবিত্রস্থান হিমসাগর নামক জলাশয়। জলাশয়টি ফকির ঠাকুরের সময়ে তাঁহারই ইচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধ। দোলমেলা উপলক্ষে সহস্র সহস্র ভক্ত ইহাতে অবগাহন করিয়া

১. অশোক মিত্রের District Hand books, Nadia-তে ডালিমতলাকে একটি tank বলে উল্লেখ করা হয়েছে : 'In addition to the above (places visited by pilgrims) two tanks, named Dalimtala and Himsagar are also visited by the pilgrims, both of these tanks are associated with the name of the sect (Kartabhaja)।' পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বন, ২য় খণ্ড, অশোক মিত্র সম্পাদিত গ্রন্থে পৃঃ ৩৪৩-এ উদ্ধৃত। তথ্যটি রীতিমত বিভ্রান্তিকর।—সম্পাদক

পুণ্য লাভ করেন,—ডালিমতলায় ধর্ণা দিবার পূর্বে আর্ত পীড়িতদের এখানে অবগাহন অবশ্য প্রয়োজনীয়। বর্তমানে জলাশয়টির অবস্থা শোচনীয়। একাধিকবার জলাশয়টির সংস্কারের চেষ্টা হইয়াছে—কিন্তু ভক্তদের কুসংস্কার এবং মালিকদের স্বার্থের সংঘাত ইহার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন রানাঘাটের S. D. O. থাকাকালে জলাশয়টির সংস্কারের চেষ্টা করিয়া পূর্বোক্ত কারণে ব্যর্থ হন। এখনও মাঝে মাঝে এটির সংস্কারের কথা উঠে—কিন্তু সেরূপ উদ্যোগ আয়োজনের অভাব।

(ঙ) দোল মহোৎসব, মেলা ও অন্যান্য উৎসব

আধুনিককাল পর্যন্ত ঘোষপাড়ার প্রধান আকর্ষণ দোল মহোৎসব ও মেলা। এই উৎসব প্রবর্তিত হইয়াছিল ফকির ঠাকুরের সময় হইতে ; কিন্তু পূর্বে যাহা ছিল মুষ্টিমেয় ভক্ত সম্মেলন পরে তাহা পরিণত হয় সুবৃহৎ মেলা ও উৎসবে। প্রতি বৎসর দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে এই মহোৎসবের আয়োজন করা হয়। পূর্বে ইহার স্থায়িত্ব ছিল প্রায় ১০ দিন ; পরে অবস্থা বিপর্যয়ে ইহা কমিয়া ৩।৪ দিনে পরিণত হইয়াছে। মেলার উৎসবমুখর শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল রামদুলাল ও ঈশ্বরচন্দ্রের আমলে এবং ঐ অবস্থা অব্যাহত ভাবে চলিয়া আসিতেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় কল্যাণীতে মিত্রশক্তির সামরিক ঘাঁটি স্থাপিত হওয়ায় ঘোষপাড়াতে যাতায়াতের নানা বিধিনিষেধ আরোপিত হয় এবং বর্তমানে মানুষের অর্থনৈতিক দুর্গতির দরুণ এবং দেশ বিভাগের ফলে বহু ভক্ত পাকিস্থানে [বর্তমানে বাংলাদেশ] পড়িয়া যাওয়ায় মেলার শ্রীবৃদ্ধি এবং ভক্ত সমাগম কমিয়া গিয়াছে। একদা যে এই মেলায় প্রচুর জনসমাগম হইত তাহার বহু প্রমাণ আছে। পূর্বে এই মেলা উপলক্ষে বহু স্পেশাল ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা হইত। নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে এ জেলার বিভিন্ন মেলা উৎসবের যে বিবরণী আছে তাহাতে দেখা যায় দোল উপলক্ষে ঘোষপাড়ায় জন সমাগমের সংখ্যা ছিল প্রতিদিন গড়ে ১০,০০০ (দশ হাজার)।

এই মেলা উপলক্ষে যাহারা সমাগত হইত স্বভাবতই তাহাদের মধ্যে নানাধরণের লোক থাকিত। সহজিয়া কর্তাভজা সম্মেলন উপলক্ষে এই মেলায় যেমন একদিকে বহু ভক্ত সাধক সন্ন্যাসীর সমাগম হইত অন্যদিকে আর্ত, আতুর, অর্থী, প্রার্থী, মানতকারী, ব্যবসায়ী, কৌতূহলী দর্শক ইত্যাদি সব শ্রেণীর লোকই এখানে আসিত। যে কোন মেলাতেই যেমন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু সন্ন্যাসীর সমাগম ঘটে—এখানেও তেমনি নানা মতের, বিশেষ করিয়া অনুরূপ সহজিয়া মতের বা বৈষ্ণবভাবাপন্ন বহু সাধুসন্ন্যাসীর আগমন ঘটিত। হিমসাগরে স্নান করিয়া ডালিমতলায় ধর্ণা দিলে রোগতাপ, দেহ বিকৃতির নিরাময় হয় এই প্রসিদ্ধির ফলে—ঘোষপাড়া মেলায় সমাগতদের একটি বিরাট সংখ্যা ছিল—

আর্ত-আতুর-মূক-বধির-বিকলাঙ্গদের। আজও এই শ্রেণীর সমাগতের সংখ্যা নিতান্ত স্বল্প নহে।[১] এ ছাড়া মেলার শৃঙ্খলাবিধান, শান্তি ও স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদির নিমিত্ত সরকারী বেসরকারী কর্মী স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যাও খুব কম নহে।

মেলায় সমাগত ভক্তবৃন্দ আম্রকুঞ্জ ও লিচু বনেই অবস্থান করে। অনেকের আখড়াস্থান পূর্বনির্দিষ্ট এমন কি বংশানুক্রমিক। এইভাবে পূর্বনির্দিষ্ট আখড়া বজায় রাখিবার জন্য ভক্তবৃন্দ ঠাকুরবাড়িতে খাজনা-প্রণামী দিয়া থাকে। ঐ আমবাগানেই তাঁহারা সামান্য আচ্ছাদন দিয়া বাসস্থান নির্মাণ করিয়া রন্ধনাদির ব্যবস্থা করিয়া মেলার কয়েকদিন অবস্থান করে। সন্ধ্যায় ও অবসর সময়ে মহাশয়েরা ধর্মালোচনা করেন অথবা শ্রীশ্রীযুতের পদ বা অন্য কীর্তনাদি গান করা হয়। বাকী সময় পূজা মানৎ অথবা সমাগত দোকান পশারে ক্রয় বিক্রয়াদি করিয়া সময় কাটান হয়। দিবাভাগে পূজা ও মানতের সংখ্যাই বেশি। কেহ মনোবাসনা পূরণের আশায় পূজা দেন, কেহ বা পূর্ববর্তী মানত ফলপ্রসূ হওয়াতে পূজা দেন। সাধারণভাবে পূজাঅর্ঘ্য প্রদান ছাড়াও প্রতীক প্রদানও হয় প্রচুর। যেমন, যে মূক সে হয়তো মানৎ করে কথা বলিতে পারিলে সোনা অথবা অন্য কোন ধাতুর জিহ্বা অর্ঘ্য দিয়া পূজা দিবে, বন্ধ্যা নারী হয়তো মানৎ করিলেন সন্তানলাভ করিলে ধাতব পুতুল দিবেন। ডালিমতলা এবং সতীমায়ের মন্দিরে প্রতিবৎসর এইরূপ অসংখ্য প্রতীক প্রণামী পড়িয়া থাকে। বস্তুত ইহার মধ্যদিয়া ঠাকুরবাড়ির বিভিন্ন শরিকের যথেষ্ট আয়েরও ব্যবস্থা হয়।

দোল উপলক্ষে সমাগত যাত্রীদের মধ্যে ঠাকুরবাড়ি হইতে অন্ন প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা ছিল। যিনি যে শরিকের যাত্রী তিনি সেই বাড়ি হইতে অন্ন প্রসাদ পাইতেন। সাধারণত যেকোন একদিনই যাত্রীরা প্রসাদ পাইবার অধিকারী ছিলেন, তবে বিশেষ অনুগৃহীত কোন কোন যাত্রী উৎসব স্থিতিকালের প্রতিদিনই প্রসাদ পাইতেন। অন্ন প্রসাদ বাদেও অনেক সময় সুবিধার জন্য চাউল, ডাইল ইত্যাদি 'সিধা' দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। ভক্তেরা ইহা লইয়া গিয়া নিজেদের আখড়ায় রান্না করিয়া খাইতেন। এ সমস্ত বাবদে ঠাকুরবাড়ির ব্যয় হইত প্রচুর। এক হিসাবে এই ব্যয় ভক্তেরাই নির্বাহ করেন কারণ তাঁহাদের প্রণামী ও খাজনা হইতেই এই ব্যয় নির্বাহ হইয়া থাকে।

১. পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা ২য় খণ্ড, অশোককুমার মিত্র সম্পাদিত গ্রন্থে অরুণকুমার রায় সংকলিত তথ্যে জানা যায়: 'মেলাটি বহুকালের প্রাচীন, শোনা যায় মহাকবি গিরীশ ঘোষ মহাশয় এই মেলায় একবার আসিয়াছিলেন। পূর্বে মেলাটি প্রায় একমাস স্থায়ী হইত।' পৃঃ ৩৬৫; এবং আরও 'প্রতিবৎসর দোলপূর্ণিমাতে 'সতীমার' উৎসব উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ ভক্ত এসে উপস্থিত হন ঘোষপাড়ায়। এই বৎসরও লক্ষাধিক লোক এসেছিলেন এই মেলাতে।' পৃঃ ৩৫২। ['এই বৎসর' – বলতে সম্ভবত ১৯৬০ সালকে বোঝানো হয়েছে।]—এ ছাড়া উচ্ছৃঙ্খল আমোদার্থী, বেশ-বিলাসীদেরও যে সমাগম ঘটত এমন তথ্যও দুর্লভ নয়। সংযোজন দ্র.—সম্পাদক

মেলা উপলক্ষে সরকারী তরফ হইতেও নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। স্বাস্থ্য ও শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা ইহার মধ্যে প্রধান। নানা প্রকার Sanitary ব্যবস্থা করা ছাড়াও অস্থায়ী হাসপাতালও স্থাপন করা হয়। জলকষ্ট নিবারণের জন্য অস্থায়ী নলকূপ স্থাপনও সরকারী ব্যবস্থার অন্যতম। এইসব ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ঠাকুরবাড়ির বিভিন্ন শরিক পক্ষ হইতে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা সরকারকে দেওয়া হয়। এ ছাড়াও বর্তমানে মেলা ও উৎসবের জমি সরকার গৃহীত হওয়ায় তাহার খাজনা স্বরূপও ৫০০ (পাঁচশত) টাকা দিতে হয়। ঠাকুরবাড়ির পক্ষ হইতে আগত স্বেচ্ছাসেবকগণের আহার বাসস্থান ইত্যাদি ব্যবস্থার জন্যও প্রায় পাঁচশত টাকা ব্যয় হয়। অর্থাৎ মেলা উপলক্ষে ঠাকুরবাড়ির ব্যয়ের পরিমাণ বার্ষিক ছয় হাজার টাকা। অন্যদিকে মেলা উপলক্ষে যে বাজার বসে তাহা হইতে খাজনা বাবদ আয় হয় তিন চার হাজার টাকা।[১]

মেলা উৎসবের বর্তমান অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়। পূর্বেকার দশ দিনের মেলা বর্তমানে তিন চার দিনের ব্যাপ্তিতে সীমাবদ্ধ। কল্যাণী নগর স্থাপনের উদ্দেশ্যে ঠাকুরবাড়ির জায়গা জমি খাস হইয়া যাওয়ায় মেলায় আগত যাত্রীদের বাসস্থানেরও অসুবিধা হয় এবং পূর্ববর্ণিত নানা কারণে যাত্রীর সংখ্যা ক্রমেই কমিতেছে। এই ধারা চলিতে থাকিলে মেলা একেবারে বন্ধ হইয়া যাওয়াও বিচিত্র নহে।

মেলায় সমাগত যাত্রীদের সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া, দর্শনীয় স্থানগুলির সংস্কার সাধন করিয়া মেলাকে এবং তাহার মধ্য দিয়া ধর্মমতকে আরও জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার চেষ্টা পূর্বেও কিছু কিছু হইয়াছে—বর্তমানেও চলিতেছে। ঠাকুরবাড়ির উন্নতি সাধন ও ভক্তবৃন্দের সুবিধাবর্ধনের উদ্দেশ্যে গত ১৩৪২ সালে একটি সমিতি গঠিত হয়। কর্তামহাশয়ের বংশধরগণের ইহাতে পূর্ণ সহযোগিতা ছিল। স্বর্গীয় সুরেন্দ্রবাবু ছিলেন ঐ সমিতির সভাপতি। স্বর্গীয় গোপালকৃষ্ণবাবু ছিলেন সহ-সভাপতি, এবং বর্তমান গ্রন্থকার ছিলেন সম্পাদক। সমিতির নাম ছিল 'কর্তাভজন সত্য সাধন সমিতি'। সমিতি খুব যে ফলপ্রসূ হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। পরে ১৩৬০ সালে 'সত্যধর্ম সেবক সংঘ' নামে আর একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠাকালে গ্রন্থকারও উহার একজন সদস্য ছিলেন। এই সমিতি এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট জীবন্ত ও উৎসাহী। ইহাদের চেষ্টায় অনেক সংস্কার ও নির্মানকার্য সাধিত হইয়াছে—এবং আরও কিছু হইবার আশা করা যায়।

দোল উৎসব বাদেও ঘোষপাড়াতেও আরও কিছু কিছু উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

১. স্বভাবতই আধুনিক কালে পূর্বোক্ত ঐ হিসেবের কিছু পার্থক্য ঘটেছে। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর জীবিতকালের হিসেব দিয়েছেন। সম্পাদক

ইহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বৈশাখী রথ। বৈশাখ মাসের প্রথম পূর্ণিমা তিথিতে এই রথ উৎসব উদ্‌যাপিত হয়—৮ দিন পরে হয় পূর্ণযাত্রা। পূর্বে রথ ছিল দারু নিমিত। বর্তমানের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি ধাতু নির্মিত রথটি দান করিয়াছেন—স্বর্গীয় গোপালকৃষ্ণবাবু। এছাড়া তিথি হিসাবে আর যেগুলি ছোট বড় উৎসব সহকারে উদ্‌যাপিত হয় সেগুলি সবই তিরোধান দিবস। রামশরণের সংসারের প্রত্যেকের তিরোধান দিবসই তিন দিনের অনুষ্ঠান—অধিবাস, মূল ক্রিয়া ও সমাপ্তি—এই পর্যায়ে পালিত হয়। তবে উৎসবের আয়োজন স্বভাবতই সব ক্ষেত্রে সমান নয়। রামশরণের তিরোভাব উৎসব (প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসের শুক্লা ৪র্থী, ৫মী ও ষষ্ঠী তিথি) সতী মাতার তিরোধান উৎসব (প্রতি বৎসর দুর্গাদেবীর কল্পারম্ভ দিবস ও তার পর দুই দিন) দুলাল চাঁদের তিরোধান উৎসব (চৈত্র কৃষ্ণপক্ষে বারুণী তিথি ও তারপর দুই দিন) ঈশ্বরচন্দ্রের তিরোধান উৎসব (প্রেত পক্ষ আরম্ভের পূর্ব দিবস ও তার পর দুই দিন) সরস্বতী দাসীর তিরোধান উৎসব (চান্দ্র চৈত্র কৃষ্ণ পক্ষীয় নবমী, দশমী ও একাদশী তিথি)—ইত্যাদি এগুলির মধ্যে প্রধান।

(চ) শ্রীশ্রীযুতের পদ।

কর্তাভজাদিগের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ বলিতে বিশেষ কিছু নাই। এই সম্প্রদায়ীরা বৈষ্ণবদিগের বিভিন্ন গ্রন্থাদি অনেক সময় নিজেদের বলিয়া বিবেচনা করেন এবং ঐ সমস্ত গ্রন্থ পাঠ বা শ্রবণ ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে পালন করেন। ইহাদের নিজস্ব, সাম্প্রদায়িক একমাত্র গ্রন্থ 'ভাবের গীত' বা 'শ্রীশ্রীযুতের পদ'। দুলাল-চাঁদ কর্তৃক রচিত—এই ধর্ম সম্পর্কিত সঙ্গীতগুলিই পূর্বোক্ত ঐ নামে অভিহিত।[১] সঙ্গীতগুলিতে 'লালশশী' ভনিতা দেখা যায়। লালশশী দুলাল-চাঁদের নামের সংক্ষেপিত ছদ্মরূপ। দুলালের 'দু' বাদ দিয়া চাঁদের প্রতিশব্দ শশী যুক্ত করিয়া ঐ নাম গঠিত। লালশশী অনেক সময় 'শশীলাল' রূপেও উল্লিখিত আছে। এই সঙ্গীতগুলির মধ্যে এই ধর্মসংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যগুলির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতাগুলির ভাষা এমনিতে খুব সহজ সরল—তবে অনেক সময় বাউলরীতি অনুসরণ করিয়া হেঁয়ালিভাব বা রহস্যময়তা (সন্ধ্যা ভাষা বা সন্ধা ভাষা) সৃষ্টির চেষ্টা আছে। অনেক আরবা, পার্শী এমন কি কিছু ইংরাজী শব্দ

১. বিস্তারিত আলোচনা সংযোজন ২-এ দ্র.

এবং বাউলদের অনেক পারিভাষিক শব্দ কবিতাগুলির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।[১] কবিতাগুলির সাহিত্যিক গুণ সত্যই প্রশংসনীয়। ডঃ সুকুমার সেন কবিতাগুলিকে রবীন্দ্রপূর্ব বাংলা সাহিত্যের মধ্যে দুর্লভ কবিত্বমণ্ডিত—এমন কি কোন কোন ছত্রে গীতি কবিতা হিসাবে 'রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি' লক্ষ্য করিয়াছেন। কিঞ্চিৎ অত্যুক্তি বলিয়া মনে হইলেও—ডঃ সেনের এই বক্তব্য—কবিতাগুলির সাহিত্যিক গুণের পরিচায়ক হিসাবে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য।[২]

---

১. গীতগুলি, সওআল-জবাব রূপে গ্রথিত। দুটি গীত মিলিয়ে একটি সম্পূর্ণভাব প্রকাশিত। এই রীতি কবিগানের চাপান-উতোর নাকি সুফি প্রভাবজাত বলা দুরূহ। দ্বিতীয় সম্ভাবনাটাই প্রবল বলে মনে হয়। কয়েকটি গীতে সাম্প্রদায়িক কোনো বক্তব্যের পরিবর্তে সার্বজনীন উদার ধর্মনীতির ইঙ্গিত কিছু গীতে শাক্তপদাবলীর ভাবও লক্ষণীয়। শেষ দিকে কয়েকটি গীতে বড়াই বুড়ির উল্লেখ কৌতূহলোদ্দীপক। বিস্তারিত আলোচনা সংযোজন ২-এ দ্র.।—সম্পাদক

২. কর্তাভজার কথা ও গান: ড. সুকুমার সেন (বিশ্বভারতী ১০ বর্ষ পৃ:১৬)।

পরিশিষ্ট

ক

ঠাকুর বংশের কুলজিনামা

রামশরণ পাল (কর্তাবাবা)

স্ত্রী সরস্বতী দাসী (সতী মা) (গোবিন্দ চন্দ্র ঘোষের কন্যা)

রামদুলালল বা দুলালচাঁদ
স্ত্রী (৩য়া) দিগম্বরী (সেজমাতা)[১]

আশাপূর্ণা (কন্যা)
(স্বামী ধনীরাম পাল)

ভগবতী (কন্যা)

রাধামোহন

কুঞ্জবিহারী
স্ত্রী কৃতার্থময়ী

মথুরামোহন

ঈশ্বরচন্দ্র (ন'বাবু)
স্ত্রী শিবসুন্দরী

ইন্দ্রনারায়ণ[১]
স্ত্রী কেদারময়ী

কন্যা*

ধরণীধর
স্ত্রী
করুণাময়ী
হরিদাস
স্ত্রী
সরস্বতী দাসী

বীরচাঁদ
স্ত্রী
কুসুমকুমারী
শৈলেশ্বর
স্ত্রী
জ্ঞানদাবালা

রসিকলাল
(২য় পুত্র)
স্ত্রী ভবদাসুন্দরী
সুরেন্দ্রনাথ
স্ত্রী
মনোরমা
কালীকৃষ্ণ
ইত্যাদি

সত্যচরণ
(৩য় পুত্র)
গোপালকৃষ্ণ
স্ত্রী
নির্মলাবালা
১। কালাচাঁদ
২। সত্যশিব
(মানুবাবু)
৩। ইত্যাদি।

সরস্বতী ট্রাষ্ট এষ্টেট

* দুলালচাঁদের কন্যার নাম জানা নাই। ঈশ্বরচন্দ্রের দুই কন্যা ছিল ; নাম (১) রাজুবালা (ওরফে কালী) (২) মোক্ষদা সুন্দরী। বীরচাঁদের কন্যাগণের নাম (ক) কিরণ বালা (খ) সরোজিনী (গ) কৃষ্ণভামিনী।

১. রামদুলালের চার বিবাহ। নদীয়া কাহিনীতে রামদুলালের পাঁচটি পুত্র চার স্ত্রীর গর্ভজাত বলে উল্লিখিত। সেখানে ইন্দ্রনারায়ণের নামেও ইন্দ্রচন্দ্র রূপে লিখিত।—সম্পাদক

বাঁকাচাঁদ

ঠাকুর বংশ প্রসঙ্গে আর একজনের নাম স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে—তিনি কর্তামাতার পালিত পুত্র বাঁকাচাঁদ। মূলতঃ ঠাকুরবংশীয় না হইলেও ইনি ঠাকুরবংশীয় রূপেই গণ্য। কথিত আছে—ইঁহার গর্ভধারিণী—জনৈকা বন্ধ্যা রমণী কর্তামাতার আশীর্বাদে পুত্রবতী হন এবং বাঁকাচাঁদকে লাভ করেন। কিন্তু জন্মের পর বাঁকাচাঁদ প্রায় অস্থিহীন মাংসপিণ্ডের মত দেখিতে হন বলিয়া মাতা তাঁহাকে মনোদুঃখে কর্তামাতাকে অর্পণ করেন। কর্তামাতার মহিমায় ইনি ক্রমে প্রায় স্বাভাবিক দেহ লাভ করেন। অবশ্য দৈহিক বিকৃতি কিছুটা থাকিয়া যায় বলিয়া ইঁহার নাম হয় বাঁকাচাঁদ। ইনি ঠাকুর পরিবারে কর্তামাতার অন্যতম পুত্র হিসাবেই গৃহীত হইয়াছিলেন। কর্তামাতা ইঁহার শিক্ষা দীক্ষা এবং পরে বিবাহাদির ব্যবস্থা করিয়া ঠাকুরবাড়ীর পূর্বধারে স্বতন্ত্র বাড়ী করিয়া দেন। ঠাকুর পরিবারের একজন হিসাবে ইনিও পারিবারিক বিভূতির অধিকারী, এবং সেই হিসাবে ভক্তগণ কর্তৃক পূজিত হন। ইঁহার বাসগৃহও পবিত্রস্থান বলিয়া বিবেচিত।

সংযোজন—১

স্তুতি নিন্দার পসরা ঃ একটি মূল্যায়ন

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তৎকালীন নদীয়া জেলার সন্নিহিত কয়েকটি অঞ্চলে তিনটি লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছিল। সহজিয়া ধারার অনুবর্তী এই তিনটি স্বতন্ত্র লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে সাধনপদ্ধতি ও আচার আচরণে কিছু কিছু অমিল সত্ত্বেও রীতিমত সাদৃশ্যও বিদ্যমান। বাহ্যত তারা পৃথক সম্প্রদায় হলেও আন্তরধর্মে তাদের মধ্যে যে ঐক্যসূত্র বিদ্যমান তাতে এ অনুমান মিথ্যা নয় যে তারা একই মূল প্রবাহের তিনটি ভিন্নমুখী ধারা। এই তিনটি ধারা হল,—ঘোষপাড়াকেন্দ্রিক কর্তাভজা সম্প্রদায়, বৃত্তিহুদা কেন্দ্রিক সাহেবধনি সম্প্রদায় এবং কুষ্ঠিয়ার লালন ফকিরের সম্প্রদায়। এছাড়াও সন্নিহিত অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কিন্তু অনুরূপ মতবাদী বলরামভজা, খুশি বিশ্বাসী ইত্যাদি সম্প্রদায়ের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কেন একটি বিশিষ্ট অঞ্চলে বিশেষ যুগে (অল্প আগে পরে) এমন একটি ধর্মান্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল সে বিষয়টি রীতিমত কৌতুহলোদ্দীপক। আমাদের আলোচ্য মূলত কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মূল্যায়ন হলেও সামাজিক এবং যুগগত পটভূমি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করে নেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে মনে হয়।

ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র-শাসনের নাগপাশে যখন বাঙ্গালী সমাজ নিপীড়িত হচ্ছিল, সমাজ যখন বিভেদপীড়িত হয়ে আত্মঘাতী উৎকেন্দ্রিকতায় মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হয়েছিল তখন অর্থাৎ সেই ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করে মুক্তির হাওয়া বইয়ে দিলেন। সাধারণ মানুষের মনে তখন নতুন করে আশার আলো দেখা দিল, আত্ম-মাহাত্ম্যের উপলব্ধির প্রেরণায় তারা উদ্বুদ্ধ হল। ভারত তথা বাংলা তো বটেই বিশেষ করে নদীয়া ভেসে গেল সেই ভাববন্যায়। আচার অনুষ্ঠান, বিধিনিষেধ. তন্ত্রমন্ত্রকে উপেক্ষা করা হৃদয়াবেগের সেই অম্লান প্রবাহে মিলিত হল জাতিধর্ম নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণ। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর থেকেই সেই বন্যার প্রবাহ স্তিমিত হয়ে এল। আচার অনুষ্ঠান, সংস্কার, ভেদাভেদের শৈবালদাম সেই অখণ্ড ধারাতে ছোটবড় নানা বাধা সৃষ্টি করতে লাগল। চৈতন্যদেবের ভক্তিরস ধারা নতুন নতুন শাস্ত্রীয় শাসন ও বিধিনিষেধের চাপে নিস্তেজ হয়ে পড়ল। ভগবানের থেকে গুরু হয়ে উঠলেন বড়। মানবমহিমার প্রশস্ত ভাববন্যার মুখে বাঁধ রচিত হল।

কিন্তু এই প্রাণপ্রবাহকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা সম্ভব ছিল না।

সমাজবহির্ভূত দারিদ্র্যলাঞ্ছিত নিপীড়িত মানুষের মধ্যে এই সহজ প্রাণের ঐক্য ফল্গু স্রোতের মত ক্ষীণধারায় হলেও চিরকাল বহমান ছিল। ভেদবিভেদপীড়িত, শাস্ত্রশাসনপিষ্ট, মানুষ চিরকাল ঐক্যের কামনা ও সহজসাধনার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে। চৈতন্যদেবের প্রভাবে নবোদ্ভূত সেই প্রাণপ্রবাহ চৈতন্য-তিরোধানের পর আবার স্তিমিত হয়ে গেলেও তলে তলে ব্রাত্য অন্ত্যজ সাধারণ মানুষ নিজেদের প্রাণের তাগিদে সেই সহজ-ধারাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে ছিল সেই প্রাণের ধারার কিছুটা প্রাতিষ্ঠানিক সংঘবদ্ধ উদ্বোধন কামনায়। তাই, কিছুই বিস্ময়কর নয় যে, পূর্বে যে লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায়-গুলির নাম করেছি তার প্রত্যেকটিরই উদ্ভব শাস্ত্রনির্ধারিত, বিধিবদ্ধ, উচ্চবর্ণ দ্বারা পরিচালিত ধর্মাচরণের বিরোধিতা করে এবং ভেদবিভেদহীন মানব মহিমা উদ্বোধনের কামনায়। এইসব ধর্মমতের প্রবর্তকও প্রতিটি ক্ষেত্রে তথাকথিত নিম্নবর্ণের কোনো দরিদ্র হিন্দু বা মুসলমান; কর্তাভজাদের ক্ষেত্রে যেমন প্রথমত একজন মুসলমান ফকির পরে সদ্গোপজাতীয় একজন দরিদ্রচাষী। আরো লক্ষণীয়, সন্নিহিত অঞ্চলের মূলত দারিদ্র্যপীড়িত জনসাধারণের মধ্যেই এদের প্রভাব ও প্রসার। অবশ্য—কর্তাভজা সম্প্রদায়ের উদ্ভব এবং প্রাথমিক প্রভাব সন্নিহিত অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরে ব্যাপকভাবে অন্যান্য অঞ্চলে এবং ভদ্র-শিক্ষিতজনের মধ্যেও এর প্রসার ঘটেছিল। কিন্তু সে অনেক পরের ইতিহাস।

বস্তুত এইসব লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায়গুলির উদ্ভব বিকাশ আলোচনায় অঞ্চলটির কিছু গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। তৎকালীন কৃষিভিত্তিক বৃহত্তর নদীয়াতে অনাবাদী জমির প্রাচুর্যে দারিদ্র্য ছিল অতি ব্যাপক। সম্ভবত পলাশির যুদ্ধ-ক্ষেত্রের সান্নিধ্যও এই দারিদ্র্য বিস্তারে সহায়ক হয়েছিল। এই অঞ্চলের জন-বসতির একটি বৃহত্তর অংশও ছিল তথাকথিত নিম্নজাতীয় এবং স্বভাবতই আর্থিক বিন্যাস-ব্যবস্থায় দরিদ্র। এই সব সাধারণ মানুষদের মধ্যে প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রায় যেমন ছিল দারিদ্র্যজনিত যোগসূত্র তেমনি এদের মধ্যে ছিল শাস্ত্র শাসনের পীড়ন থেকে মুক্তির জন্যে একটি সুচিরপোষিত কামনা। সম্ভবত নিত্যানন্দের প্রচারক্ষেত্র হিসাবেই এই খোলা হাওয়ার সমন্বয়বাদী কামনা এই অঞ্চলে বেশি করে প্রশ্রয় পেয়েছিল। এইসব কারণেই এই অঞ্চলে পূর্বোক্ত লোকায়ত ধর্মগুলির বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছিল।

লোকায়ত ঐ ধর্মসম্প্রদায়গুলির মূলবাণী ও সাধনপদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, প্রতিটির মধ্যেই, কমবেশি, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্থাৎ আত্মোপলব্ধি এবং আত্মমহিমা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান ইত্যাদি বিভিন্ন মতাদর্শের সমন্বয় প্রচেষ্টা। এদের উদ্ভবের উৎসে যে-মূল প্রেরণার কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি তারই যুগগত অনুসিদ্ধান্ত এই সমন্বয় কামনা। শেষোক্ত এই বিষয়টি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। এদের বেশির ভাগেরই নাড়ির

যোগ যেমন একদিকে সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনার সঙ্গে অন্যদিকে স্থফি মতাদর্শের সঙ্গে। এর সঙ্গে মিশেছে তৎকালীন খ্রীষ্টীয় প্রভাব। কর্তাভজাদের মধ্যে খ্রীষ্টানী প্রভাব এঁদের দশ নিষেধাজ্ঞা পালন ও 'দাম্বিক মজলিশ' নামক অনুষ্ঠান, যার মুখবন্ধে গান করা হয়ঃ 'অপরাধ মার্জনা কয় প্রভু· ····' ইত্যাদি। (দ্র. ভাবের-গীত ৪র্থ সং ১৩৮৪ পৃঃ গ)। (গ্রন্থ মধ্যে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য)। সাহেবধনিদের মধ্যেও অনুরূপ খ্রীষ্টানী প্রভাব লক্ষণীয়। তাঁদের একটি গানঃ

দশ আজ্ঞা পালন কর।
প্রভুর নামের গুণে দিব্যজ্ঞানে ত্রিভুবনে ডংকা মারো।
... ...
... ...
গোঁসাই চরণ বলেন কুবিরকে
প্রেম করো যুতে প্রভুর সাথে পরম স্থখে
শুনরে সাফ অর্থ বলি ঈষু করিবেন নিস্তার।

সাহেবধনিদের গানে হিন্দু-মুসলমান সমন্বয়ের বানীও স্পষ্টঃ

১। আল্লা মহম্মদ রাধাকৃষ্ণ একাঙ্গ একাত্মা সার।

অথবা

২। আল্লা আলজিহ্বায় থাকেন
কৃষ্ণ থাকেন টাকরাতে।

রামবল্লভীদের উপাস্য; 'কালীকৃষ্ণ গড খোদা।' (সাহেবধনিদের গান-গুলি দ্রষ্টব্য—'সাহেবধনী সম্প্রদায় তাদের গান'—স্থধীর চক্রবর্তী)।

এই পটভূমিকার কথা স্মরণ রেখে এবার কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মূল্যায়নে অগ্রসর হওয়া যাক।

২

এই সব উপসম্প্রদায়গুলির মধ্যে নিঃসন্দেহে কর্তাভজা সব থেকে বেশি পরিচিত। এইদিক দিয়ে বাউলদের পরেই এঁদের স্থান। পরিচিতি বলতে কিন্তু সর্বদা শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠা বোঝায় না। অন্তত কর্তাভজাদের পরিচিতিতে প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দার পশরাই বেশি ভারি। নিন্দা বা প্রশংসা যে দৃষ্টি নিয়েই হোক যাঁরা কর্তাভজাদের প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন—তাঁদের আলোচনায় কিছু কিছু পার্থক্য সত্ত্বেও কয়েকটি সাধারণ তথ্যও পরিবেশিত হয়েছে। সেগুলিকে সংক্ষেপে নিম্নোক্ত প্রকারে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে।

(ক) আউলচাঁদ বা আউলেচাঁদ নামক জনৈক বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান

ফকির অথবা বাউল মতাবলম্বী গৃহবিবাগী কোন হিন্দু গুরু এই ধর্মমতের মূল প্রবর্তক। [একজন সমালোচক অবশ্য ফকিরের অস্তিত্বে সন্দিহান।]

(খ) সম্প্রদায় হিসাবে কর্তাভজাদের প্রতিষ্ঠা পূর্বোক্ত প্রবর্তকের ২২ জন শিষ্যের অন্যতম রামশরণ পাল নামক জনৈক সদ্গোপ এবং তাঁর বংশধরগণের দ্বারা।

(গ) এই সম্প্রদায়ে বর্তমানে শিষ্যদের মধ্যে হিন্দুদের প্রাধান্য থাকলেও একদা বহু মুসলমানও এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্নবিত্ত, অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত জনসাধারণ এবং নারীদের সংখ্যাধিক্য।

(ঘ) এই ধর্মমত সহজিয়া বাউল সাধনার বিবর্তন প্রসূত। ফলে একদিকে এর নাড়ীরযোগ বৈষ্ণব সাধানার সঙ্গে অন্যদিকে এর মধ্যে ইসলামী সুফী মতবাদের প্রভাবও বিদ্যমান। এঁদের আচার অনুষ্ঠান বিধিনিষেধে কিঞ্চিৎ খ্রীষ্টানী প্রভাবও অনুমেয়।

(ঙ) এই ধর্মমতের লক্ষনীয় বৈশিষ্ট্য জাতিভেদহীনতা, বিশিষ্ট কোন দেবদেবী সম্পর্কে আগ্রহহীনতা, সহজসরল জীবনাচরণ ইত্যাদি।

পূর্বোক্ত এই বৈশিষ্ট্যগুলি বা এঁদের মধ্যে প্রচলিত কিছু স্বতন্ত্র পারিভাষিক শব্দ যথা, গুরু ও শিষ্যের পরিবর্তে যথাক্রমে 'মহাশয়' ও 'বরাতি', এবং উপদেশাবলীর নাম 'ট্যাকশালী বোল',—এসব কিছু এমন নিন্দনীয় ব্যাপার নয়। বরং যুগ ও সমাজের পটভূমিকায় বিচার করলে এসবের উপযোগিতা অনেকাংশে স্বীকার্য। তবুও বিস্ময়ের কথা, এই সম্প্রদায়ের উদ্ভবের কিছুকাল পর থেকেই বহুদিন পর্যন্ত এঁদের সম্পর্কে যত আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে তীক্ষ্ণ নিন্দাবাণী ও তির্যক বক্রোক্তিই বেশি। এবং লক্ষণীয়, যদিও এই সম্প্রদায়ের উদ্ভবে এবং প্রসারে সচেতনভাবে, কিম্বা যদি ধরেও নেওয়া যায় স্বার্থের খাতিরে —অর্থাৎ সম্প্রদায়ীদের সংখ্যাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে—একটি সমন্বয় প্রচেষ্টা এঁদের মধ্যে ছিল, তবুও এর বিরুদ্ধে আক্রমণ এসেছে রক্ষণশীল হিন্দু, খ্রীষ্টান তথা মুসলমান সব সম্প্রদায়ের কাছ থেকেই। কিছু কিছু প্রশংসার বাণীও যে উচ্চারিত হয়নি তা নয়; কিন্তু তুলনায় তার পরিমাণ শুধু কম তাই নয়—তার ধারও কম। আবার এটাও লক্ষণীয়, তৎকালীন যুগে এত নিন্দা বিরোধিতা সত্ত্বেও এর জনপ্রিয়তায় তেমন ভাটা পড়েনি। সাম্প্রতিক কালে এই ধর্মের বা সম্প্রদায়ের পূর্বেকার সে জৌলুশ নেই—তা কিন্তু ঐ নিন্দাবিরোধিতার জন্যে নয়; তা কালগত বিবর্তন ধারার ফলে। বিষয়টি তাই একটু খুঁটিয়ে বিচার করা প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে প্রথমে নিন্দা স্তুতির একটা খতিয়ান করে নেওয়া যাক।

৩

প্রথমে নিন্দাবাণীগুলির পরিচয় নেওয়া যাক।

এই সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রথম লিখিত বিবরণ উপস্থিত করেন **W. W. Ward**

Asiatic Researches Vol II—তে। এরও আগে মিশনারী কেরী ও মার্শমান ঘোষপাড়াতে রামদুলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এমন তথ্য পাওয়া যায়। [গ্রন্থমধ্যে রামদুলাল সম্পর্কিত আলোচনার পা. টী দ্র.] তাঁদের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায় নি। সহজেই অনুমেয়, এই মিশনারীরা কর্তাভজা ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এর খোঁজখবর নিতে অগ্রসর হন নি। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম সাম্রাজ্য বিস্তার। সুতরাং Ward-এর বিবরণে তথা বর্ণনার অন্তরালে কর্তাভজা সম্পর্কে তির্যক উক্তি স্বাভাবিক :

He (Ramsaran) **persuaded** multitudes that he could cure the leprosy and other diseases......

......it is **pretended** he (i.e, fakir) communicated his supernatural powers to (Ramsaran)

... ..from a state of deep poverty he (Ramsaran) became rich, and his son now lives in affluence.

উক্তিগুলি একেবারে হয়ত মিথ্যা নয়। কিন্তু সত্য উদ্‌ঘাটনের উদ্দেশ্য অপেক্ষা তির্যক মনোভাবই persuaded, pretended প্রভৃতি শব্দাবলীতে ব্যঞ্জিত। (স্থূলাক্ষর আমার)।

H. H, Wilson-এর ভারতীয় ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি সম্পর্কিত বিবরণ, যা পরে গ্রন্থবদ্ধরূপ নিয়েছিল (১৮৬১) তারও প্রথম প্রকাশ Asiatic Researches—১৮২৮-এ। উইলসন ওআর্ডের রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, এ তথ্য অবগত হওয়া যায় তাঁর রচনার পাদটীকা থেকে। উইলসনের দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক মিশনারী-সুলভ নয়, তবুও কর্তাভজা ও ভারতীয় বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণে বিদেশী মনোভাব একেবারে অনুপস্থিত নয়। তাই তিনি ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের পরিবর্তে নিম্নবর্ণের ব্যক্তিদের গুরুগিরি প্রভৃতির তাৎপর্য সমাজ ও যুগের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ না করে তির্যক মন্তব্য করেছেন : 'the innovation is nothing in fact, but an **artful** encroachment upon the authority of the old hereditary teacher or Gossains and an attempt to invest a new family with spiritual power ! the attempt has been so far succesful, that it gave affluence and celibrity to the founder..." (স্থূলাক্ষর আমার)।

কর্তাভজাদের সমৃদ্ধির সমসাময়িক কালের অন্যতম ধর্মগুরু রামকৃষ্ণদেব অনেকবার এঁদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। কথামৃত ২য়/৪র্থ/৫ম ভাগে একাধিকবার কর্তাভজাদের সাধনার স্বরূপ সম্পর্কে রামকৃষ্ণের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে

উচ্চারিত যেসব মন্তব্য রয়েছে, অন্তত আপাতদৃষ্টিতে তা খুব শ্রদ্ধেয় নয়। বস্তুত রামকৃষ্ণের পক্ষে প্রকৃতি সাধনার কোনো রীতিকে সমর্থন করা স্বাভাবিক ছিল না। যদিও রামকৃষ্ণের উক্তিগুলি থেকে বোঝা যায় তিনি এঁদের সাধনার রীতি বৈশিষ্ট্য ঠিকমত বুঝেছিলেন এবং 'যতমত ততপথ' নীতিতে বিশ্বাসী রামকৃষ্ণ খুব তীক্ষ্ণভাষায় কোনো মতের নিন্দা না করলেও, তিনি এঁদের প্রশংসাও করতে পারেন নি—একথাও সত্য। অক্ষয়কুমার সেনের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুথিতে উল্লিখিত :

সমকালে প্রচলিত কর্তাভজামত।
ভগবানে যাইবার এও এক পথ ॥
পথটি বড়ই নোংরা উপমা তাহার। . . .

এই উক্তি রামকৃষ্ণের মনোভাব প্রকাশক বললে অন্যায় হয় না। সিদ্ধির অন্যতম পথ হিসাবে স্বীকার করেও পথটিকে নোংরা বলা হয়েছে।

এরপরই উল্লেখযোগ্য অক্ষয়কুমার দত্তের উক্তি। কর্তাভজা সম্পর্কিত এঁর আলোচনাও গ্রন্থবদ্ধ হবার আগে তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫০-এ। ইনি উইলসনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই-যে ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন সে তথ্য সুবিদিত (এবং উভয়েরই তথ্য সরবরাহক সম্ভবত একই ব্যক্তি—ভৈরবচন্দ্র দত্ত)। কিন্তু একথাও স্বীকার্য, তিনি অন্ধভাবে উইলসনকে অনুসরণ না করে নিজের বিচারবোধ অনুযায়ী বিভিন্ন সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ের তত্ত্বগত ভিত্তি ও আচার অনুষ্ঠানের বিশ্লেষণ ও মন্তব্য করেছেন। বস্তুত কর্তাভজা প্রভৃতি উপসম্প্রদায় সম্পর্কিত আলোচনায় অক্ষয়কুমারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ বিরূপতার যে অভিযোগ করা হয় তা বোধহয় কিছুটা অতিরঞ্জিত। বস্তুবাদী, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন, ব্রাহ্মঘেঁষা অক্ষয়কুমারের পক্ষে সহজিয়া আচার অনুষ্ঠানকে বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তবুও ঐতিহাসিকের মনোভাব নিয়ে অক্ষয়কুমারই প্রথম তাঁর আলোচনায় প্রতিষ্ঠাতা ধর্মগুরুর আদর্শের সমুন্নতি ও তত্ত্বকালীন বাস্তব অবনতি, এ দুয়ের পার্থক্য নির্দেশ করেছিলেন। তাঁর উক্তি : 'বোধহয় সম্প্রদায় প্রবর্তকের অভিপ্রায় উত্তমই ছিল, কিন্তু তাহার গতানুগতিকেরা তৎপ্রদর্শিত পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন।' নিন্দার অনন্য লক্ষ্যে অন্বিষ্ট না হলেও তিনি এই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে একটা নতুন অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, যা ইতিপূর্বে আর কেউ করেন নি। ওআর্ড, উইলসন প্রভৃতি সম্প্রদায়প্রবর্তক বা প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে অলৌকিকতার ভেল্কি দেখিয়ে অর্থোপার্জনের অভিযোগ করলেও ব্যভিচারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নি। অক্ষয়কুমার তা করেছেন।

এর সমসাময়িক কালে, কিছু আগে বা পরে, সংবাদ প্রভাকর, সোমপ্রকাশ

প্রভৃতি সাময়িক পত্রে কর্তাভজা সম্প্রদায় সম্পর্কে কিছু প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদকদ্বয়—ঈশ্বরগুপ্ত এবং দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ—উভয়েই ছিলেন রক্ষণশীল হিন্দু। স্বভাবতই বর্ণাশ্রম-সংস্কার-বিরোধী এই নব ধর্মপ্রচেষ্টা সম্পর্কে এঁদের পক্ষে খুব শ্রদ্ধাশীল হওয়া সম্ভব নয়। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর কিছু কিছু কবিতাতেও কর্তাভজাদের মানুষকে 'কর্তা' বলে স্বীকার করা, 'লোক মধ্যে লোকাচার, সদগুরু মধ্যে একাকার' প্রভৃতি বাণীর প্রতি তির্যক মনোভাব প্রকাশ করেছেন। সংবাদ প্রভাকরে ৩০. ৩. ১৮৪৮-এ প্রকাশিত পত্রেও দেখা-যায়, 'যদিও এই ধর্ম শাস্ত্রসম্মত নহে ও ইহার বাহ্য প্রকরণ সমস্ত অনাচারযুক্ত তবুও ইহার অন্তরে কিছু সারত্ব থাকিবেক, এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে।' ইত্যাদি উক্তির মধ্যে রক্ষণ-শীলতার ভিতরও কিছু উদার দৃষ্টির পরিচয় আছে। বিশেষত এই ধর্মের ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে 'সৎকুলোদ্ভব মান্য বিদ্বান এবং সূক্ষ্মদর্শিজন'ও যে ছিলেন একথাও এখানে উল্লিখিত। কিন্তু এর ষোলো বছর পরে সোমপ্রকাশে প্রকাশিত প্রতিবেদনে (৪.৪.১৮৬৪) নিন্দার দিকেই ঝোঁক বেশি। 'ইতর লোকের মধ্যে এই ধর্মের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব। ভদ্রলোকেরা ইহার আদর করা দূরে থাকুক, যাহারা এই ধর্ম অবলম্বন করে তাহাদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকেন, তবে যে ২।৪ জন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে এই ভ্রমে পতিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায় তাহারাও মূর্খতায় ইতর লোকের তুল্য। * * * ইহার ভক্তদিগের নানাপ্রকার যথেচ্ছচারিতার বিলক্ষণ সুবিধা আছে।' দোলমেলায় সমাগত 'যাত্রীদিগের মধ্যে চৌদ্দ আনা স্ত্রীলোক। কুলকামিনী অপেক্ষা বেশ্যাই অধিক, পুরুষদিগের সকলেই প্রায় মূর্খ।' এই প্রতিবেদনে তৎকালীন 'কর্তা' ঈশরচন্দ্রের বিলাস ব্যসন উচ্ছৃংখলতার ইঙ্গিত আছে এবং এই ধর্মপ্রচার যে নিতান্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিত স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা তারও উল্লেখ আছে: 'এই সকল দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যিনি এই ধর্ম প্রবর্তিত করিয়াছেন, তিনি বিলক্ষন বুদ্ধিমান, চতুর ও ঔদার্যশালী। এই ধর্মের সৃষ্টি করিয়া তাঁহার নিজনামকে চির প্রসিদ্ধ করিবার অভিলাষ ব্যতিরিক্ত অন্যকোন অভিসন্ধি ছিল কিনা, এখন নির্ণয় করা কঠিন।' এই উক্তিতে ঔদার্যশালী শব্দটি ছাড়া সবই তির্যক মনোভাব প্রকাশক।

এরপরেই নাম করতে হয় পাঁচালি গায়ক দাশরথি রায়ের (১৮০৬-৫৭)। ইতিপূর্বে ইংরেজি বাংলায় প্রকাশিত যে সব উক্তির উল্লেখ করেছি তা সবই লিখিতরূপে প্রকাশিত হয়েছিল বলে তার প্রভাব শিক্ষিত জন ছাড়া অন্যের মধ্যে খুব ব্যাপক হতে পারে নি। তার স্বরূপও অবিমিশ্র ছিল না। কিন্তু দাশরথি রায় অবিমিশ্র এবং তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ছাড়া এঁদের আর কিছুই উপহার দেন নি আর জনপ্রিয় সঙ্গীতের মাধ্যমে তা প্রকাশিত ছিল বলে এর প্রভাবও ছিল ব্যাপক। দাশরথি রায় কর্তাভজাদের সম্পর্কে বেশ কয়েকটি গান রচনা করে-

ছিলেন এবং তার মধ্যে কর্তাভজাদের উদ্ভব, ধর্মীয় আচার আচরণ, মানব মহিমা প্রচার, জাতিভেদ না মানা ইত্যাদি প্রতিটি বিষয় ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে গীত হয়েছে এবং এদের বিরুদ্ধে ব্যভিচার সমেত নানা অভিযোগও উত্থাপিত হয়েছে। [দ্র. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী সম্পাদিত, দাশরথী রায়ের পাঁচালী (১৯৬২) পৃঃ ৬৬২—৬৬৯] রক্ষণশীল দাশরথি এই জাতি বিচারহীন নবধর্মের প্রচারে যে রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন তা তাঁর শ্লেষাত্মক ভাষা ব্যবহারেই বোঝা যায়। বস্তুত দাশরথি কেবল কর্তাভজা নয়, বিধবা বিবাহ, বৈরাগী বৈষ্ণব প্রভৃতি কারো সম্পর্কেই সহানুভূতিশীল ছিলেন না। কবির মনোভাব প্রকাশক সামান্য একটু উদ্ধৃতি দেওয়া যাক :

যেমন ঢেঁকিশালে কুকুর কর্তা, বনের কর্তা পশু।
শ্মশানের ভূত কর্তা, চোরের কর্তা যাস্থ ॥

*　　*　　*　　*

মাঠে গোঠে রাখাল কর্তা আঁতুড়ে কর্তা দাই।
ভেড়ার গোয়ালে বাছুর কর্তা, এ কর্তা তাই ॥ (পৃঃ ৬৬৫)

এঁদের বিলোপের জন্যে উন্মুখ হয়ে দাশরথি শেষ পর্যন্ত রাজশক্তির আনুকূল্য কামনা করেছেন :

ভেঙ্গে বলা নয়, ভেঙ্গে বলা নয়,
বাঁচে কুল, অনুকূল হয়ে যদি
রাজা দেন সাজা রে। (পৃঃ ৬৬২)

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত কেদারনাথ দত্ত (ভাঁড়) প্রণীত নকশাধর্মী রচনা 'সচিত্র গুলজার নগর' গ্রন্থে দুইবার কর্তাভজা ধর্মের প্রসঙ্গে পরোক্ষ উত্থাপিত হয়েছে। [দ্র. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত উক্ত গ্রন্থের পুস্তক বিপণি সংস্করণ, জুলাই ১৯৮২-এর পৃঃ ৪৯-৫২, এবং ৮১—৮৭]। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের বর্ণনাই লেখকের উদ্দেশ্য। সম্পাদক শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেই রকম মনে করেছেন। আসলে লেখক কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই কর্তাভজার নামের আড়ালে ব্রাহ্মধর্ম বা সম্প্রদায়ের ব্যঙ্গচিত্র রচনা করেছেন। তাই কেবল কর্তভজা না বলে 'নিষ্কলঙ্ক' কর্তাভজা বলেছেন। যাই হোক লেখকের পরোক্ষ উক্তি থেকেও কর্তাভজা সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের আভাস পাওয়া যায়। এই মনোভাব শ্রদ্ধার নয়, যদিও তা পুরোপুরি নিন্দারও নয়। অবশ্য নিন্দার ভাগই বেশি। লেখক যে চিত্র রচনা করেছেন তার মধ্যে কল্পনা এবং ইচ্ছাকৃত বিকৃতি অনেক আছে। লেখক কর্তাভজা সম্পর্কে ভালভাবে বিশেষ কিছু জানতেন না, বোঝা যায় তার পরিবেশিত তথ্য থেকে। যেমন তিনি লিখেছেন, 'মহাত্মা দুলাল পাল এই ধর্ম সংস্থাপন করেন' (পৃঃ ৪৯)। এই

সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ঐতিহাসিকভাবে রামশরণ পাল, দুলালচন্দ্র পাল নন, যদিও সম্প্রদায়কে দৃঢ় সাংগঠনিক ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর গৌরব তাঁর। সম্প্রদায়ের তত্ত্বভিত্তি এসেছে আউলচাঁদ নামক ফকিরের কাছ থেকে। এসব কথা গ্রন্থমধ্যে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। যাইহোক, কর্তাভজা সম্পর্কে তাঁর পরবর্তী উক্তি, 'কর্তাভজারা সামান্য কথায় বলে যে 'মেয়ে হিজড়ে পুরুষ খোজা তবে হবে কর্তাভজা' আজকাল কালের কুচক্রে ঠেকে একথা উপহাসের মধ্যে হয়েছে,......পরে কালেতে অজ্ঞানতা দোষে জীতেন্দ্রিয় লোকের অভাবে আমাদের উপাসকেরা সারতত্ত্ব ছেড়ে ইন্দ্রিয় সুখের পরতন্ত্র হয়ে, ধর্মের পথ অধর্মে রোধ করে (পৃঃ ৫০)।—ইত্যাদি খুব অশ্রদ্ধার কথা নয়। এর পরেই লেখক ইঙ্গিত করেছেন কর্তাভজাদের দুর্নীতি দেখে তাদের সঙ্গে মতান্তরের ফলে ব্রাহ্মধর্মের উৎপত্তি—একথা তথ্য হিসাবে ভ্রান্ত। উভয় ধর্মের মধ্যে জাতিভেদ না মানা, আত্মদর্শনের প্রাধান্য প্রভৃতি সাদৃশ্য কিছু কিছু আছে তবে কর্তাভজার দলছুট হয়ে ব্রাহ্মধর্মের উৎপত্তি, এ উক্তি ব্যঙ্গাত্মক। লেখক একঢিলে দুই পাখী মারতে গিয়ে উভয়ত লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছেন। তবে গ্রন্থমধ্যে সম্প্রদায় কর্তার যে-চিত্র আছে তা সম্ভবত ঈশ্বরচন্দ্র পালের আদলে অঙ্কিত।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'জাল প্রতাপ চাঁদ' গ্রন্থেও কর্তাভজা সম্প্রদায়ের পরোক্ষ প্রসঙ্গ আছে। লেখকের স্বকীয় কোন মন্তব্য এখানে নেই। তবুও প্রাসঙ্গিক যে চিত্র আছে তাতে একদিকে যেমন কর্তাভজা সম্প্রদায়ের জনপ্রিয়তার ইঙ্গিত আছে তেমনি অন্যদিকে কিছু নিন্দাবাণীরও ইঙ্গিত আছে। [দ্র. উক্তগ্রন্থের ১৩৮৫, ১লা বৈশাখে প্রকাশিত মণ্ডল বুক হাউস সংস্করণের 'জালরাজা ধর্ম প্রণেতা' নামক ২৩ তম অধ্যায় পৃঃ ১১৫—১১৭)। মোকদ্দমায় হেরে জালরাজা জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করেন শ্রীরামপুর চন্দননগর অঞ্চলে। মোকদ্দমার রায় বেরিয়েছিল ১৮৩৯ এর জুলাই এ। জালরাজার মৃত্যু হয়েছিল ১৮৫২।৫৩ তে। সুতরাং বর্ণনার কাল ১৮৪০—৫০। ঘোষপাড়ায় তখন ঈশ্বরচন্দ্রের আমল। ঐ সময়ে রাজা নিজে 'সত্যনাথ' নাম নিয়ে একটি ধর্মসম্প্রদায়ের পত্তন করেন। তিনি নিজেও মন্ত্র দিতেন, তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যেরাও মন্ত্র দিতেন। 'তিনি যে মন্ত্র দিতেন তাহা বিষ্ণুমন্ত্র নহে, শক্তিমন্ত্রও নহে। তাঁহার দীক্ষা প্রণালী, অর্চ্চনা প্রভৃতি নূতন প্রকার। স্থানে স্থানে লোকে তাঁহাদের ঘোষপাড়ার দল বলিয়া জানে।' (পৃঃ ১১৭)।

স্পষ্টত কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সাদৃশ্যে এই নূতন সম্প্রদায়ের উদ্ভব। তাই রাজা নিজে নাম গ্রহণ করেছিলেন 'সত্যনাথ'। ঘোষপাড়ার ধর্মের অন্য নাম 'সত্যধর্ম'। অবশ্য রাজা এই ধর্মে রীতিমত দীক্ষিত হয়েছিলেন কিনা জানা নেই। হয়ত ঘোষপাড়ার মতের জনপ্রিয়তা এবং সম্প্রদায়কর্তার অর্থপ্রাচুর্যে তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। লেখক নিজে ঐ অঞ্চলে গিয়ে নিজের কানে শুনে

সম্প্রদায়কর্তারূপে রাজার নিম্নোক্ত বর্ণনা দিয়েছেন: 'শুনিলাম, তিনি তথায় ঠাকুর সাজিয়া দিন যাপন করিতেন। নিত্য সন্ধ্যার সময় বেশ্যারা আসিয়া এক এক পঞ্চপ্রদীপ আর ঘণ্টা লইয়া একত্রে তাহাকে আরতি করিত; তিনি ঠাকুরের মত সিংহাসনে বসিয়া দীপের নৃত্য দেখিতেন।' (পৃঃ ১১৫-১৬)। এ চিত্র শ্রদ্ধেয় নয়। বিশেষত বেশ্যা এবং অন্যান্য স্ত্রীলোকদের মধ্যেই মূলত এই ধর্মের প্রসার ছিল একথাও ঘোষপাড়ার ধর্ম প্রসঙ্গে অনেকের নিন্দাউক্তির সঙ্গে সদৃশ। জাল প্রতাপচাঁদের এই নতুন ধর্মের বর্ণনা তাই লেখকের নিজস্ব মত কিনা জানা না গেলেও, পরোক্ষে কর্তাভজাদের প্রতি নিন্দাই বলা চলে।

১৮৯৬-এ প্রকাশিত নবদ্বীপ পণ্ডিত মণ্ডলীর সভাপতি যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'Hindu Castes and Sects' গ্রন্থে গুরুবাদী সম্প্রদায়গুলিকে রীতিমত হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে। অধ্যায়ের নামকরণেই তা স্পষ্ট: 'The **Disreputable** Guruworshipping sectes of Bengal'। এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে কর্তাভজা যে সব থেকে প্রধান একথা স্বীকার করেও এঁদের সম্পর্কে আলোচনায় যোগেন্দ্রনাথ শ্রদ্ধার কোন উপাদান খুঁজে পান নি। (দ্র. উক্ত গ্রন্থের ১৯৬৮-তে পুনরমুদ্রিত সংস্করণের ৩৮৩-৮৫ পৃঃ)। যোগেন্দ্রনাথের দৃষ্টি নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের রক্ষণশীলতা প্রভাবিত ফলে সহজিয়া সাধনা তাঁর কাছ থেকে কোনো শ্রদ্ধাই প্রত্যাশা করতে পারে না। যোগেন্দ্রনাথ তাই এই সম্প্রদায় কর্তার মিথ্যাচার, দুস্থপীড়িত নরনারীর, বিশেষত নারীদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অর্থশোষণের জমিদার সুলভ প্রচেষ্টার উল্লেখ করেছেন। লেখকের ভাষায়: To be ready with a **pretext for exacting money** from his followers, (Ramsaran) declared that he was the proprietor of every human body and that he was entitled to claim rent from every human being for allowing his soul to occupy his body. The idea is very similar to that involved in the Maratha claim of chouth, and has, though on a much smaller scale, served very similar purposes. To enforce his right, and to give a pecuniary interest to his followers, the karta appoints the chief among the latter as his bailiffs and agents for collecting his revenue. The majority of the dupes of the sect are women who readily pay the small tax that is demanded of them, for the sake of securing long life to their husbands and children." (স্থুলাক্ষর আমার) মূল ধর্মের তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলির গুণাগুণ বিশ্লেষণ অপেক্ষা সম্প্রদায়কর্তার চাতুর্য ইত্যাদির উল্লেখই যোগেন্দ্রনাথের বর্ণনায় স্থান পেয়েছে। এমন কি মূল প্রবর্তক

আউলচাঁদের অস্তিত্ব বা তাঁর কাছ থেকে রামশরণের শিষ্যত্ব গ্রহণ যোগেন্দ্রনাথের কাছে মনগড়া অভিসন্ধিমূলক রটনা—'Pure myth' বলে মনে হয়েছে।

কুমুদনাথ মল্লিক নদীয়া কাহিনীতে (২য় সং ১৩১৯) এঁদের ইতিহাস বিবৃতি প্রসঙ্গে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে পরবর্তীকালে, ব্যভিচার দোষ অনুপ্রবেশের অভিযোগ করেছেন। অবশ্য মূলধর্মে বা প্রবর্তকের অভিপ্রায়ে এসব দোষ ছিলই না বরং এর বিপরীত মনোভাবই ছিল—এ উক্তি'ও তিনি করেছেন: 'পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা তিনগুণ সেই কারণেই বোধহয় ইহাদের মধ্যে ব্যভিচারের স্রোত এত প্রবল। একদিন যে ধর্মের মূল মন্ত্র ছিল মেয়ে হিজরে পুরুষ খোজা তবেই হবে কর্তাভজা সেই উচ্চ আদর্শ কিরূপ দুর্দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। পরস্ত্রীগমন বা তৎচিন্তা উক্ত ধর্মপ্রবর্তকের সম্পূর্ণ বিধিবিরুদ্ধ, তথাপি বহুসংখ্যক নরনারী সর্বদা একত্র সহবাস করায় এক্ষণে নরসেবা ও নারী সেবাই এই ধর্মের সর্বনাশের মূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে' (পৃঃ ২৪০)। গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী নামক গ্রন্থে সতীশচন্দ্র দে-ও (১৯৩৩) অনুরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেছেন: 'কিন্তু এই সকল দোষের জন্য (নানাবিধ পাপাচার) কর্তাভজা ধর্মকে দায়ী করা চলে না। গৌরাঙ্গদেবের পবিত্র ধর্মেও নেড়ানেড়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে এ পাপাচার বিদ্যমান আছে' (পৃঃ ৩৬)। এঁদের মনোভাব যাইহোক—অভিযোগের সত্যতায় কিন্তু এঁরা বিশ্বাসী।

স্বামী তত্ত্বানন্দ 'The Vaisnava Sects of India' গ্রন্থে (প্রকাশের তারিখ নেই) অথবা ডঃ ননীগোপাল গোস্বামী 'চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থে' (১৩৬৯) কর্তাভজাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। (পৃঃ ১৭৬)। এঁরা নতুন কথা বিশেষ কিছু বলেন নি। বিশেষত স্বামী তত্ত্বানন্দ কর্তাভজা ও অন্যান্য উপসম্প্রদায় সম্পর্কিত আলোচনায় (পৃঃ ৫৪-৮২) অক্ষয়কুমার দত্তের বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত ইংরেজী অনুবাদ করেছেন। কর্তাভজাদের উল্লেখ আরো অনেক স্থানেই আছে। কিন্তু গ্রন্থপঞ্জী রচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবুও ডঃ সুকুমার সেনের কয়েকটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা বা মন্তব্যে যে নিরপেক্ষ ও মুক্ত মনের পরিচয় আছে তার স্বতন্ত্র উল্লেখ প্রয়োজনীয় মনে করি। এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড অপরার্ধ, ভারতকোষ ২য় খণ্ডে 'কর্তাভজা' প্রবন্ধ এবং কর্তাভজার কথা ও গান (প্রবন্ধ) বিশ্বভারতী ১০ম বর্ষ ১ম সংখ্যা।

নিন্দার প্রসঙ্গে ফিরে আসি। সুরথনাথ চক্রবর্তীর 'BAULS: The spiritual vikings' (১৯৮০) গ্রন্থে কর্তাভজাদের সম্পর্কে যেটুকু আলোচনা আছে তা পড়লে মনে হয় নিতান্ত নিন্দার জন্যেই যেন লেখক ঐ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন: 'Bauls are known either as Bauls or Sahajia Bauls. There is a subgroup among the latter, known as Kartabhaja.

They are not large enough in number to be well known but they are known with not much repute because their practices are improper and physically oriented so much that they are out of taste. For this reason I do not care to quote any of their songs just to prove the point' (পৃঃ ২৭)। উক্তিটি বেশ বিচিত্র! কর্তাভজারা যদি বিশেষ পরিচিত না হয় এবং তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ-গুলি প্রমাণের এতই অনাঁহা তবে তাঁদের প্রসঙ্গ উত্থাপনেরই বা প্রয়োজন কি!

আর একটি গ্রন্থের উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গ শেষ করি। গ্রন্থটি রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'বাংলা দেশের ইতিহাস।' গ্রন্থের ধর্ম ও সমাজ নামক ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে বেশ কয়েকবার কর্তাভজাদের সম্পর্কে কিছু মন্তব্য আছে। মন্তব্যগুলি প্রশংসার নয়। রমেশচন্দ্রের নিন্দার মুখ্য বিষয় পরকীয়া প্রেম অর্থাৎ পরস্ত্রীর সহিত অবৈধ প্রণয় ও ব্যাভচার। চৈতন্যদেবের প্রভাবে এর বন্যা কিছুটা মন্দবেগ হলেও তাঁর তিরোধানের পর একশত বৎসরের মধ্যে পুনরায় তা প্রবলবেগে প্রবাহিত হল এবং বৌদ্ধ সহজিয়া, তান্ত্রিকতা, প্রভৃতি বৈষ্ণব ধর্মের আবরণে তা পুনরাবির্ভূত হল। 'ইহার ফলে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কর্তাভজা প্রভৃতি বহু সহজিয়া সম্প্রদায় এবং কিশোরীভজা প্রভৃতি এমন নানা প্রকার অনুষ্ঠান বাংলায় প্রচলিত ছিল সুরুচি লঙ্ঘন না করিয়া যাহার বর্ণনা করা অসম্ভব' (পৃঃ ২৬৪-৬৫)। পরকীয়া প্রেমসাধনা সম্পর্কে বিরূপতাই ডঃ মজুমদারের কর্তাভজাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারের মূল উৎস হলেও তিনিও কিন্তু অবিমিশ্র নিন্দা করেন নি। তাঁর উক্তি: 'বর্তমান যুগের দৃষ্টিতে এই সকল সম্প্রদায়ের অনেক প্রথা ও ব্যবস্থা আপত্তিজনক বলিয়া মনে হইলেও ইহাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ লক্ষণীয়। মধ্যযুগের কবীর নানক প্রভৃতি সাধুসন্তেরা যেমন হিন্দুশাস্ত্রের বিধি হিন্দুর প্রচলিত ধর্মানুষ্ঠান ও সামাজিক বিধান সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া এক বিশ্বজনীন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং ইহার মূল ভিত্তি ছিল কেবলমাত্র ভগবান ও ভক্তের মধ্যে ঐকান্তিক প্রেম ও ভক্তি বাংলার সহজিয়াদের মধ্যেও সেই ভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার উৎসস্থল ছিল বাংলার বৌদ্ধ সহজিয়া মতের গ্রন্থ।' (পৃঃ ২৭০)।

৪

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিন্দাবাণীর উল্লেখ করা হল। আগেই বলেছি নিন্দার তুলনায় প্রশংসার পশরা অনেক কম। লোকায়ত এই উপসম্প্রদায় সম্পর্কে শিক্ষিতজনের অনাগ্রহই প্রশংসার পরিমাণের স্বল্পতার কারণ। ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শে প্রভাবিত অনেকেই সংস্কার বিরোধী এই লোকধর্মের বাহ্যিক উৎসব

অনুষ্ঠানের কথা কিছু জানলেও এঁদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেশার আগ্রহ বোধ করেন নি। ফলে এঁদের তত্ত্বে নতুন বা শ্রদ্ধেয় কিছু লক্ষ্য করেন নি। শিক্ষিত অভিজাতদের মধ্যে যাঁরা এঁদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেশার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁরা কেউ কেউ এঁদের গুণগ্রাহী ছিলেন এবং সেকথা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন। এঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য ভূকৈলাসের মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের নাম। গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত হয়েছে ইনি কর্তাভজা ধর্মমতে আগ্রহী হয়েছিলেন এবং সম্ভবত দীক্ষাও গ্রহণ করেছিলেন। অভিজাত বর্ণহিন্দুদের মধ্যে ইনিই সর্বাগ্রগণ্য যিনি সেযুগে কর্তাভজা ধর্মমত বা এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে সশ্রদ্ধ উক্তি করেছেন। ইনি যে কর্তাভজা ধর্মমতে আগ্রহী হয়েছিলেন, অধ্যাপক সুকুমার সেন একাধিকবার এই বিষয়টির উল্লেখ করেছেন। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের রচিত এর 'করুণা নিধান বিলাস' গ্রন্থে রামশরণ পাল সম্পর্কে সশ্রদ্ধ উক্তি আছে—গ্রন্থমধ্যে তার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি জালরাজা প্রতাপচাঁদও শেষজীবনে এই ধর্মমতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তবে সেই আকর্ষণ কতটুকু তত্ত্বের জন্যে আর কতটুকুই বা কর্তা ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনযাত্রা প্রণালীর জন্যে তাতে সন্দেহ আছে। তাই সে প্রসঙ্গে অনুল্লিখিত থাকাই ভাল।

অতঃপর উল্লেখযোগ্য ব্রাহ্মসেবাব্রতী শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। অবশ্য শশিপদর উক্তি আমরা উত্তমপুরুষে পাইনি। কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি. এ. প্রণীত 'নবযুগের সাধনা' নামক শশিপদর জীবনীতে কর্তাভজাদের সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধার উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে জানা যায় শশিপদ ১৮৬৫তে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৭০-এর কাছাকাছি সময়ে তিনি শ্রমজীবী সমিতি (Workingmens Club) গঠন করেন। 'শশিপদবাবু যৎকালে শ্রমজীবী-সমিতি স্থাপন করেন সেই সময়ে বরাহনগরে কর্তাভজা নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনেকগুলি উপাসনা স্থান ছিল।...শ্রীযুক্ত শশিপদবাবু সময়ে সময়ে সেই স্থানে যাইতেন। তিনি স্বীকার করেন যে তাঁহাদের উপাসনার ঐকান্তিকতার দ্বারা তিনি সেই দলে মিশিয়া বিশেষরূপে উপকৃত হইতেন' (পৃঃ ৪৪)।

রাণাঘাটের S. D. O হিসাবে কবিবর নবীনচন্দ্র সেনকে একবার (১৮৯৫) ঘোষপাড়ার দোলমেলার তদারকি করতে হয়েছিল। নবীনচন্দ্র কয়েকদিন সেখানে ক্যাম্প করে থেকে কর্তাভজাদের আচার অনুষ্ঠান পূজার্চনা প্রভৃতি অন্তরঙ্গভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। 'আমার জীবন'-এ লেখক-এর বিস্তারিত বিবরণী লিপিবদ্ধ করেছেন। ইনি যদিও তৎকালীন সম্প্রদায়-কর্তাদের সম্পর্কে মোটেই শ্রদ্ধানুভবের কারণ খুঁজে পান নি তবুও ভক্তদের ঐকান্তিকতা প্রভৃতিতে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কবি এঁদের সরলতা নিষ্ঠা, জাতিভেদ-হীনতা প্রভৃতির প্রশংসা করেছেন। প্রত্যাবর্তনের পথে ট্রেনে আকস্মিকভাবে

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেছিল। নবীনচন্দ্র এই ধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিরূপতা দূর করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই ঘটনার বিবরণ গ্রন্থমধ্যে আছে, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

দীনেশচন্দ্র সেন 'বৃহৎবঙ্গ' (১৩৪১) গ্রন্থে (২য় খণ্ড, পঞ্চদশ অধ্যায়, অষ্টম পরিচ্ছেদে) 'গুরুবাদ ও পরকীয়া' সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন (পৃ: ৭৬৯-৮২)। আলোচনায় স্বভাবতই কর্তাভজাদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। দীনেশচন্দ্র পরকীয়া সাধনা, গুরুবাদ প্রভৃতি সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রশংসা করেছেন। কর্তাভজা প্রভৃতিদের জাতপাত না মানা, সর্বধর্মমিলন ও সর্বপ্রকার হিন্দু সংস্কারগুলির মূলে কুঠারাঘাত প্রচেষ্টাকে একদিকে যেমন প্রাচীন ঐতিহ্যগত অন্যদিকে তা রীতিমত সাহসিকতার নিদর্শন বলে দীনেশচন্দ্র উল্লেখ করেছেন। 'রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে বলসেভিক এবং অধ্যাত্মজগতে সহজিয়া—ইঁহারা প্রাচীন সংস্কার সমস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। এরূপ নির্ভীক বীরত্ব জগতে বিরল' (পৃ: ৭৭৮)। কর্তাভজাদের সম্পর্কে এঁর অন্যতম উক্তি: 'এই দলে খ্রীস্টান, মুসলমান ও হিন্দু আছে এবং যদিও নরনারীর অবাধ মিলনে কোন বাধা নাই তথাপি ইহাদের নীতি অতি উচ্চ।' দীনেশচন্দ্র বিশ্বাস করেন: 'নরনারীর প্রেম সম্বন্ধে সহজিয়াদের ধারণা অতি উচ্চ। তাহা সাধারণের বোধগম্য নহে।' (পৃ: ৭৭৫)।

ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 'বাংলার বাউল ও বাউলগান' গ্রন্থে (১৩৬৪) কর্তাভজাদের সম্পর্কে সশ্রদ্ধ আলোচনা করেছেন। লেখক কর্তাভজাকে বাউল সহজিয়ার ধারাবাহিক বিবর্তন প্রসূত বলে ব্যাখ্যা করেছেন। এঁর মতে কর্তাভজাকে বুঝতে হলে বাউল সাধনার অন্তর্নিহিত তত্ত্বকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। আপাতদৃষ্টিতে প্রকৃতিসাধনা নিন্দনীয় বলে মনে হলেও এই 'সুকঠিন যোগসাধনা' 'কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নহে—কাম দমন করিবার জন্য—কামকে প্রেমে রূপান্তরিত করিবার জন্য।'—এই দৃঢ়মত ব্যক্ত করে ড. ভট্টাচার্য অক্ষয়কুমার আনীত ব্যভিচারের অভিযোগ খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। সাম্প্রতিক কালের আর একজন সমালোচক কর্তাভজা প্রসঙ্গে বিদগ্ধ ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আলোচনা করেছেন—তিনি অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী। 'কর্তাভজনের রূপ ও স্বরূপ' নামক প্রবন্ধে। (কর্তাভজা: ধর্মমত ও ইতিহাস, ২য় খণ্ডে সঙ্কলিত)—এঁর আলোচনা কর্তাভজা ধর্মের তত্ত্বভিত্তি সম্পর্কে নিরপেক্ষ ও গভীর আলোকপাত করেছে। ইনিও দীনেশচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতির ধারা অনুসরণ করে কর্তাভজনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 'সহজ' সাধনার গভীরতার কথা বলেছেন। আবার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সমাজ ও নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মতানুসারী হয়ে কর্তাভজাদের এই প্রেমসাধনা

রাঢ়বঙ্গের আদিম নরগোষ্ঠীর একটি বিশিষ্ট ধারা বলে উল্লেখ করেছেন।

সম্প্রতি ড. রমাকান্ত চক্রবর্তী তাঁর গবেষণা Vaisnavism in Bengal (Oct. 1985)-এ বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের ইতিহাস বিবৃতি প্রসঙ্গে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করেছেন। নিরপেক্ষ ইতিহাস বিবৃতি এঁর উদ্দেশ্য, তাই সার্বিক মূল্যায়ন তাঁর গ্রন্থে না থাকলেও কিছু কিছু তির্যক মন্তব্য যেমন তিনি করেছেন তেমনি পরোক্ষ কিছু মন্তব্যে প্রশংসাও আছে।

এই সম্প্রদায়ের উদ্ভবের পশ্চাতে তৎকালীন সামাজিক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের এবং চৈতন্য-আদর্শের পতনের কথা বর্ণনা করেও গ্রন্থকার মূল প্রেরণা হিসাবে গুরু-পদবী গ্রহণ করে অলৌকিক শক্তির ভেল্কি দেখিয়ে অর্থোপার্জনের আকাঙ্ক্ষার উল্লেখ করেছেন। তাঁর, In fact miracle was the salt of the Kartabhaja sect (p 358) এবং Kartabhaja thrived on superistition and magic' (p 359) প্রভৃতি তির্যক উক্তি লক্ষণীয়। ধর্মটিকে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিকট গ্রহণীয় করে তোলার একটি সচেতন প্রয়াস এঁদের ছিল, এ কথারও তিনি উল্লেখ করেছেন। তবে তাঁর মতে এ প্রয়াস মূলত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রেরণায় নয়, জনপ্রিয়তা অর্জনের উদ্দেশ্যে। তবে এই প্রসঙ্গে তিনি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন : 'Rammohun Ray might have been inflluenced by this liberal view' (p 384)।

৫

আগেই বলেছি কর্তাভজাদের সম্পর্কে স্তুতি অপেক্ষা নিন্দার পরিমাণই বেশি। যাইহোক, স্তুতির কথা ছেড়ে দিই। নিন্দাগুলিকে অহেতুক বিদ্বেষ-প্রসূত ভেবে উড়িয়ে না দিয়ে একটু খুঁটিয়ে বিচার করলে কর্তাভজার মূল্যায়নে প্রকৃত সত্যে উপনীত হওয়া সহজ হবে। নিন্দাবিরূপতার উক্তিগুলি বিশ্লেষণ করে এঁদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলিকে তাই তালিকাবদ্ধ করা যাক :

১. ধর্মমতের প্রবর্তকের উদ্দেশ্য যাই থাক, শেষ পর্যন্ত তার থেকে অনেক অবনতি ঘটেছে। এমনকি প্রবর্তক বলতে সত্যিই কেউ ছিলেন কিনা সে বিষয়েও কারো কারো মনে সন্দেহ জেগেছে। সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতা রামশরণই সম্ভবত তাঁর অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন গুরুর মিথ্যা কাহিনী প্রচার করে নিজের গৌরব বৃদ্ধি ও স্বার্থসাধন করতে চেয়েছেন।

২. সম্প্রদায়-কর্তা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বার্থে দরিদ্র, অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত নরনারী, বিশেষত নারীদের ঠকিয়ে অর্থাৎ অলৌকিক শক্তির

ভেলকি দেখিয়ে অর্থোপার্জনে মনোযোগী হয়েছিলেন এবং সেই উপায়ে নিতান্ত দারিদ্র্য থেকে নিজের পরিবারের জন্য বংশানুক্রমিক প্রাচুর্যের ব্যবস্থা করেছেন।

৩. এঁদের মধ্যে নারী পুরুষের অবাধ মিলন প্রচলিত থাকায় ব্যভিচার দোষ অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে।

৪. এঁরা বর্ণাশ্রম, জাতিভেদ বিরোধী।

৫. দেবদেবী সম্পর্কিত প্রচলিত হিন্দুসংস্কার এঁরা, অন্তত এঁদের ধর্মীয় সম্মেলনে অর্থাৎ দোল মেলার সময়, মেনে চলার পক্ষপাতী নন।

এই অভিযোগগুলিকে সামনে রেখে কর্তাভজা সাধনার স্বরূপ ও ইতিহাস একটু পুনর্বিচার করা যাক। একমাত্র যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ছাড়া সকলেই স্বীকার করেছেন ধর্মমত হিসাবে কর্তাভজার প্রবর্তন আউলচাঁদ বা আউলেচাঁদ নামক জনৈক ফকির কর্তৃক। ওয়ার্ড ফকিরের নামোল্লেখ না করলেও তাঁর আলোচনায় ফকির-প্রসঙ্গ আছে। উইলসন ফকিরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নি তবে তাঁর অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করেও কিছু বলেন নি। অতঃপর অক্ষয় কুমার থেকে সকলেই ফকিরের প্রসঙ্গ ও নাম উল্লেখ করেছেন। বস্তুত ফকিরের অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করার কোনো কারণ নেই। একথা সত্য, ফকির সম্পর্কে কোনো পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়—কিন্তু তাঁর অস্তিত্ব যে মনগড়া কাল্পনিক গল্প নয় তার প্রমাণ তাঁর সমাধি। ঘোষপাড়াতে তাঁর স্মৃতি-নিদর্শন তেমন কিছু নেই (অথবা সচেতনভাবে তাঁর প্রাধান্য কমিয়ে দেওয়া হয়েছে—সে প্রসঙ্গে পরে আসছি)। কিন্তু বোয়ালিয়া গ্রামে তাঁর সমাধি বিরাজিত এবং কর্তাভজা বহু ভক্ত সেই সমাধিদর্শন তীর্থদর্শন তুল্য মনে করেন। কর্তাভজাদের বীজমন্ত্রেও আউলে মহাপ্রভুর নাম বিদ্যমান। সুতরাং ফকির একজন ছিলেন এবং তিনিই এই ধর্মমতের মূল প্রবর্তক। অনুমান করা যায়, তিনিই প্রথম সত্যস্বরূপ (হক) ঈশ্বরকেই মালিক বা কর্তা রূপে ভজনার কথা বলেছিলেন। পরে সেই কর্তার তাৎপর্য পরিবর্তিত হয়ে গেছে, হয়ত বা সচেতন প্রচেষ্টায়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শিষ্য গ্রহণ, জাতপাত না মানা প্রভৃতি এঁরই প্রচেষ্টায় সূত্রপাত—যে প্রচেষ্টা সে যুগে আরো অনেক অনুরূপ ফকিরগুরুর মধ্যে দেখা গিয়েছিল।

গ্রন্থমধ্যে কর্তাভজা ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে এই বিকাশের ধারায় বেশ কয়েকটি স্তর চোখে পড়বে। এর প্রথম স্তর বলা যেতে পারে ফকির কর্তৃক প্রথম ধর্মমত প্রবর্তনের স্তর। সর্বধর্ম সমন্বয় প্রচেষ্টা, মানবমহিমা প্রচার, সংস্কারমুক্তি প্রভৃতি তখন এই ধর্মের ভিত্তি ছিল। ঠিক উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের তাৎপর্যে সমন্বয়বাদী না হলেও জাতিভেদহীন, সংস্কারমুক্ত সহজ অনাড়ম্বর ভজনপূজন ইত্যাদির উদ্দেশ্য যে এই ধর্মমত প্রবর্তনের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল ছিল

একথা অস্বীকার করা যায় না। আমাদের নবীনতা যে কেবল পাশ্চাত্যের হাওয়ায় সৃষ্ট এ ধারণা বোধ হয় ঠিক নয়। দেশ ও যুগের মধ্যে এর বীজ ছিল। পাশ্চাত্যের আলো হাওয়ায় সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ড. সুকুমার সেনের একটি উক্তি স্মরণ করি। "আধুনিক কালের খোলা হাওয়া অনেক দিন হইতেই শুরু হইয়াছিল। সে হাওয়া শুধু ইউরোপীয় বণিকের পোতের পালে ঠেলা দিয়াই জানান দিয়াছিল তাহা নহে। মোগলশাসনে যত না হোক বৈষ্ণব ধর্মে খোলামেলা শিক্ষায় শাস্ত্রের বাঁধনও ব্রাহ্মণ সমাজের কেন্দ্র হইতে অসন্নিকৃষ্ট ব্যক্তি ও গোষ্ঠিদের আর খুব দৃঢ়ভাবে আঁটিয়া রাখিতে পারিল না। বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে গভীর অগভীর সম্পর্ক যুক্ত এমন নানা উপাসক সম্প্রদায় এই সময়ে দানা বাঁধিয়াছিল যেগুলির মধ্যে জাতি ও সমাজ নির্বিশেষে সমবেত উপাসনার রীতি স্বীকৃত হইয়াছিল। এমনি একটি সম্প্রদায়, নাম কর্তাভজা। ..." (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭৫, পৃঃ ৩৬৯)।

কর্তাভজার ইতিহাসের দ্বিতীয় স্তরে রামশরণ কর্তৃক সম্প্রদায়ের গোড়াপত্তন। ধর্মমত প্রচার আর শিষ্য প্রশিষ্য নিয়ে সম্প্রদায় গঠন, এক কথা নয়। এই শেষোক্ত অর্থে রামশরণ এই সম্প্রদায়ের ভিত্তি গড়ে তুললেন। প্রসঙ্গত একটি প্রশ্ন,—এই সম্প্রদায়ের নাম কর্তাভজা, সবাই এই নামে এঁদের উল্লেখ করেছেন। এঁরাও আপত্তি করেন নি যদিও এঁদের ধর্মের অন্য নাম সত্যধর্ম। কর্তাভজা নামটি কবে থেকে প্রচলিত এবং কার দেওয়া? আমার অনুমান, নামটি বোধহয় সম্প্রদায়ের বাইরে থেকে এঁদের উপর আরোপিত এবং তা সম্প্রদায় হিসাবে এঁদের প্রতিষ্ঠার পর। যাই হোক, রামশরণের হাতে সম্প্রদায় হিসাবে এঁদের প্রতিষ্ঠার পর ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য থেকেও এঁদের ক্রমিক বিচ্যুতি সুরু হয়। শেষজীবনে ফকির ঠাকুরের ঘোষপাড়া থেকে প্রস্থানও কিছুটা রহস্যজনক। জনৈক ভক্তের অসুস্থতার সংবাদে তিনি ঘোষপাড়া ত্যাগ করেন। কে এই ভক্ত? ফকিরের শিষ্যমণ্ডলীতে এঁর নাম নেই। অনুমান হয়, পরে রামশরণ যেভাবে 'গদি প্রতিষ্ঠার দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন তা বোধহয় ফকিরের মতাদর্শের অনুকূল ছিল না। ফকির বোধহয় প্রকৃষ্ট অর্থেই ফকির ছিলেন আর রামশরণ ছিলেন গৃহীসাধক। সুতরাং গৃহসুখ বৃদ্ধি সম্পর্কে তাঁর হয়ত কিছু মোহ ছিল। ধর্মের মূলনীতি ফকির-প্রবর্তিত হলেও ভক্ত-শিষ্যদের কাছ থেকে প্রণামীর পরিবর্তে 'খাজনা' আদায়, অলৌকিক গুণকর্ম দেখিয়ে সাধারণ মানুষের মনে মোহ সৃষ্টি ইত্যাদিতে ফকির অপেক্ষা রামশরণের উদ্যোগই বোধ হয় বেশি ছিল। এই নিয়েই সম্ভবত গুরুশিষ্যে মতান্তর দেখা দিয়েছিল এবং ফকিরের ঘোষপাড়া ত্যাগের মূল কারণও হয়ত তাই।

দলের মধ্যে মতান্তর যে দেখা দিতে শুরু করেছিল তা অনুমান করা যায় ফকির ঠাকুরের সমাধি সম্পর্কিত জনশ্রুতিতে। দুইদল শিষ্য দুটি পৃথকস্থানে

(বোয়ালিয়া ও পরারিগ্রামে) তাঁর দেহের পৃথক সমাধি দিয়েছিলেন। বস্তুত আউলচাঁদ-প্রবর্তিত মতাদর্শ তাঁর জীবৎকাল থেকেই, বিশেষত তাঁর তিরোধানের পর বংশগত গুরু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, ঠিক যেমন বিভক্ত হয়েছিল চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম (দ্র. চৈতন্য চরিতের উপাদান, বিমানবিহারী মজুমদার পৃঃ ১৮৭)। তাই রামশরণ পালের আখড়ার কাছাকাছি কানাই ঘোষের স্বতন্ত্র আখড়া।

ফকির থেকে রামশরণ এই স্তরান্তরের তাৎপর্য রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ। অলৌকিক গুনকর্ম দেখিয়ে অর্থোপার্জনের চেষ্টা সম্পর্কিত অভিযোগের উৎস এখানেই নিহিত। ভক্তের চোখে গুরুর অলৌকিক শক্তির অন্যতর মহিমা থাকতে পারে কিন্তু তাঁর মধ্যে যদি ঐশ্বর্য কামনা থাকে এবং দরিদ্র অবস্থা থেকে ক্রমায়াত পারিবারিক সমৃদ্ধি দেখা দিতে থাকে তবে সম্প্রদায় বহির্ভূত, বিশেষত কিছু বিরূপ মনোভাবের অধিকারী সমালোচকের কাছে তা নিন্দা অভিযোগের উপাদানরূপে প্রতিভাত হবেই। এবং এই অভিযোগের ভিত্তিগত সত্যকেও অস্বীকার করা যায় না। বস্তুত নদীয়া গেজেটে গোপাল, কৃষ্ণ যতই লিখুন, 'It will thus be seen that the Mahashay is merely a teacher and has no right to exact divine homage from his Varatis'—প্রকৃত চিত্র কিন্তু এর বিপরীত। সম্প্রদায়-কর্তা নিজেই কেবল divine homage নয়, তার প্রতীক হিসাবে 'খাজনা' exact করার দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন তাই নয়, তাঁর প্রতিনিধি (কর্মচারী) হিসাবে 'মহাশয়েরা'ও 'মালিকের ঘরের খাজনা' আদায়ে সহায়তা করতেন। প্রণামীর পরিবর্তে 'খাজনা', জমিদারী জগতের এই বিশেষ শব্দটিই ঐশ্বর্যকামনার নির্ভুল ইঙ্গিত।

এর পরবর্তী স্তরে সতীমার প্রতিষ্ঠা। রামশরণের স্ত্রী সরস্বতী দেবী—যখন সম্প্রদায়ের কর্ত্রী হন তখন যে কোনো কারণেই হোক তাঁর মহিমা রীতিমত প্রচারিত হয়ে পড়ে। হয়ত রামশরণের জীবিতকাল থেকেই এই প্রচারের সূত্রপাত। পরমেশ্বর (মালিক), আউলচাঁদ প্রভৃতি থেকে ভক্তদের মনে সতী-মার প্রতিষ্ঠা প্রবলতর হয়। তিনিই কর্তাভজাদের আরাধ্যাদেবীতে পরিণত হন। ঘোষপাড়ার মেলার অপর নাম হয় সতীমার মেলা। সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠায় এঁর প্রভাব প্রতিপত্তি ও অবদান আলোচনায় জাহ্নবা দেবীর সঙ্গে তুলনার কথা মনে হয়। এক হিসাবে ইনি জাহ্নবা দেবীর থেকেও শক্তিমতী। জাহ্নবা দেবীর মহিমা চৈতন্যদেবকে, এমন কি নিত্যানন্দকেও ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু সতীমা দেবীতে পরিণত হয়েছেন। এঁর সাধনায় অলৌকিক সিদ্ধি ছিল, তাই ভক্তের চোখে ইনি ছিলেন দেবী। কিন্তু এ কথাও সত্য, এঁর আমলেই ফকির আউলচাঁদ একেবারে পশ্চাৎপটে চলে যান এবং কর্তাভজাধর্ম সতীমা আরাধনায় পরিণত হয়।

এর পরের স্তর দুলালচাঁদের সংগঠন। রামশরণের হাতে সম্প্রদায়ের গোড়াপত্তন। সতীমায়ের আমলে মহিমাবৃদ্ধি আর দুলালচাঁদের প্রচেষ্টায় রীতিমত সংগঠন। দুলালচাঁদ বেশ শিক্ষিত ও বাস্তব দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। আদৌ ভদ্রেতরজনের মধ্যে এই ধর্মের প্রথম প্রবর্তন ঘটলেও—বহু ভদ্র শিক্ষিত জনের মধ্যে ক্রমে এই মতাদর্শের প্রসার প্রতিপত্তি ঘটেছিল—বাইরে তাঁরা প্রকাশ করুন বা নাই করুন। সেই প্রসার ঘটেছিল দুলালচাঁদের আমলেই এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় (গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রামদুলাল সম্পর্কিত আলোচনা ও পা. টী. দ্রষ্টব্য)। রামমোহন রায় এবং মার্শমান ও কেরী প্রভৃতি মিশনারীরা দুলালচাঁদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করেছিলেন। একখানি পুরাতন পুস্তিকায় দুলালচাঁদ, সম্পর্কে লেখা আছে :

রাজা রামমোহন রায় যেতেন তাঁর পাশ।
অমৃত রস পান করিয়ে মিটাইতেন আশ।
অনেক সাহেব তিনি সাথে লয়ে যান।
অনেকেই লন আশ্রয় করি প্রণিধান ॥
ডাফ সাহেব পাদ্রী যেতেন তাঁর পাশে।
লইতেন শিক্ষা যেয়ে ঘোষপাড়া আবাসে ॥

(বেঙ্গল রায় প্রেস থেকে মুদ্রিত এই পুস্তিকার সংবাদ এবং উদ্ধৃত কবিতাংশ কর্তাভজা ধর্মমত ও ইতিহাস ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯ থেকে গৃহীত)। বলা বাহুল্য। সবাই এই মতাদর্শে মুগ্ধ হয়ে ধর্মালোচনায় যোগ দিয়েছিলেন, তা কিন্তু নয়। রামমোহনের আগমন কিছুটা মতাদর্শের প্রেরণায় হলেও, মিশনারীদের আসা যাওয়া ছিল এই ধর্মের দোষ দর্শনের উদ্দেশ্যে এবং সেই সূত্র ধরেই যে এঁরা বহু কর্তাভজাকে খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করতে পেরেছিলেন সে তথ্যও আজ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। রামদুলালের মৃত্যুর পরই বহু কর্তাভজা খ্রীষ্টান ধর্ম অবলম্বন করেছিলেন সে সংবাদ জানা গেছে চার্চ মিশনারী সোসাইটির ইতিহাস থেকে (কর্তাভজা ধর্মমত ও ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫-এ উদ্ধৃত)। যাই হোক রামদুলালের আমলেই যে এই সম্প্রদায় রীতিমত সংগঠিত রূপলাভ করেছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, এঁকেই অনেকে সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করতেন। (পূর্বে উল্লিখিত সচিত্র গুলজার নগর রচয়িতার বিবৃতি দ্রষ্টব্য)। বস্তুত রামদুলালের খ্যাতি দেশের সীমা অতিক্রম করে বিদেশেও পৌঁছেছিল। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শিকাগোতে অনুষ্ঠিত Parliament of Religions-এ Advisory Council-এর সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন এবং উক্ত সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ড. রতন কুমার নন্দী তাঁর 'কর্তাভজা ধর্ম ও সাহিত্য' গ্রন্থে (১লা বৈশাখ ১৩৯১) উক্ত

নিমন্ত্রণ পত্রের প্রতিলিপি মুদ্রিত করেছেন। অবশ্য ঐ নিমন্ত্রণ পত্র প্রাপ্তির ষাট বছর পূর্বে রামদুলালের লোকান্তরপ্রাপ্তি ঘটেছিল। রামদুলালের খ্যাতির প্রমাণ হিসাবে, তবুও, বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। ইনিই ভাবের গীত রচনা করে এই সম্প্রদায়ের তত্ত্বভিত্তি যেমন সুদৃঢ় করেছিলেন তেমনি ধর্মীয় জমিদারীর পূর্ণ প্রতিষ্ঠাও এঁর হাতেই ঘটেছিল।

পরবর্তী ঈশ্বরচন্দ্র পালের সময় থেকে এই ধর্মের পতন শুরু হয়। ভক্তসংখ্যা এবং দোল মেলার উৎসব আড়ম্বর থেকে প্রথম দিকে-এই পতন ঠিকমত অনুভব করা যায় না। কিন্তু নৈতিক অধঃপতন বলতে যা বোঝায় তার সূত্রপাত এখন থেকেই।

কর্তাভজা ধর্মের ক্রমবিকাশের এই স্তরবিন্যাস থেকে বোঝা যায় এদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ গুলির কয়েকটির (পূর্বোদ্ধৃত তালিকার ১ ও ২নং) উৎস কোথায়। তালিকাভুক্ত ৩নং অভিযোগটি রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ। একটি বিষয় লক্ষণীয়, যাঁরা এই ধর্মের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ এনেছেন তাঁরা মুখ্যত তাঁদের বক্তব্য ঈশ্বরচন্দ্র পালের আমলেই উচ্চারণ করেছেন। গ্রন্থমধ্যে আলোচনায় এ কথা লক্ষ্য করেছি, সহজিয়া হিসাবে কায়সাধনা, প্রকৃতি সাধনা ইত্যাদির সঙ্গে কর্তাভজাদের নাড়ীর যোগ থাকলেও এঁদের মতাদর্শে যোগক্রিয়া প্রভৃতির প্রাধান্য কোনো দিনই নেই। সাধারণ ভক্তরা গুরুপূজা, সতীমায়ের আরাধনা, শুক্রবারের বৈঠকে ভাবের গীত গান ইত্যাদিতে উৎসাহী ছিলেন—তান্ত্রিকসাধনায় নয়। অনুমান হয়, 'কর্তারা' ও তাঁদের কর্তাগিরি রক্ষাতে বেশি যত্নবান ছিলেন তাই নিজেদেরকে ঈশ্বর স্থানীয় বলে প্রমাণ করতে যতটা উৎসুক ছিলেন প্রকৃতিসাধনা প্রচারে ততটা নয়। তবুও যাঁরা এর বিরুদ্ধে ব্যভিচার দোষের উল্লেখ করেছেন তাঁরা যে কেবল বিদ্বেষপ্রসূত হয়েই সে কাজ করেছিলেন তাও বোধহয় নয়। ঈশ্বরচন্দ্র পাল ব্যক্তিগত জীবনে খুব সংযমী ছিলেন না। তিনি রাজার হালে দিন যাপন করতেন, হয়ত কিছু উচ্ছৃঙ্খলও ছিলেন। তাঁকে কয়েদবাসও করতে হয়েছিল। এসব তথ্য আজ আর অজ্ঞাত নয়। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের উদাহরণ এবং মেলার উৎসব আবহাওয়ার অবাধ স্বাধীনতা, হয়ত একটি বিশেষ আমলে এই মেলাক্ষেত্রকে কিছু সুযোগ-সন্ধানী বারাঙ্গনা-বিলাসীবাবুদের লীলাক্ষেত্রে পরিণত করেছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের আমলে সোমপ্রকাশের প্রতিবেদক লিখেছিলেন (৪ ৪.১৮৬৪): যাত্রীদের মধ্যে নারীর সংখ্যাই বেশি এবং নারীদের মধ্যে 'কুলকামিনী অপেক্ষা বেশ্যাই অধিক।' ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবন উদ্ঘাটন করে তিনি লিখেছিলেন: 'ঈশ্বরবাবু একটি শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। অনেকগুলি স্ত্রীলোক তাঁহার চতুর্দিকে বসিয়া কেহ পদসেবা করিতেছে, কেহ গা টিপিয়া দিতেছে, কেহ মুখে আহার দ্রব্য প্রদান করিতেছে, কেহ অঙ্গে চন্দন লেপন

করিতেছে এবং কেহ গলদেশে পুষ্পমাল্য পরাইয়া দিতেছে। এই চিত্র তত্ত্ব দৃষ্টিতে (উপেন্দ্রনাথ ও জাহ্নবীকুমারের ব্যাখ্যায়) 'সুকঠিন যোগসাধনা' অথবা 'রাগানুগা আজ্ঞাসেবার দিক থেকে ভিন্নভাবের দ্যোতক' হতে পারে কিন্তু সাধারণের চোখে, এমন কি নিম্ন অধিকারী ভক্ত সাধারণের চোখেও খুব উন্নত আদর্শের প্রতীক বলে গৃহীত হত বলে মনে হয় না। তাই বলা যায় মেলা প্রাঙ্গণে গণিকাবিলাস যদি কিছু ঘটে থাকে তাতে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রশ্রয় থাকা অসম্ভব নয়। তবে এই উচ্ছৃঙ্খলতা বেশিদিন চলে নি, এ কথাও ঠিক। নবীন চন্দ্র মেলার অন্তরঙ্গ প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তেমন ব্যাপার তাঁর চোখে পড়লে তিনি নিশ্চয়ই তাঁর উল্লেখে কার্পণ্য করতেন না। পরবর্তীকালে অনেকেই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই মেলা পর্যবেক্ষণ করেছেন। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় সেই সব সমীক্ষা ও প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কেউই মেলাপ্রাঙ্গণে বারাঙ্গনা বিলাসের উল্লেখ করেন নি। সুতরাং এই মতাদর্শের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ রাগানুগা আজ্ঞাসেবা প্রভৃতি তত্ত্বদ্বারা খণ্ডন করার চেষ্টা না করেও বলা যায়, ব্যভিচার যদি কর্তাভজাদের মধ্যে কখনো এসে থাকে তবে তা মূল ধর্মাদর্শে কখনো আসেনি; এসেছিল কিছুদিনের জন্য বহিরঙ্গ মেলা উৎসবে এবং সম্ভবত ভক্তযাত্রীদের ছদ্মবেশে সখের বাবুদের দ্বারা।

অন্য দুটি অভিযোগ,—জাতিধর্ম না মানা এবং প্রচলিত সংস্কার বিরোধিতা —বস্তুত অভিযোগ না প্রশংসা তা নিয়েই প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। কর্তাভজা ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ আলোচনায় এর যুগ পরিবেশ বিস্মৃত হলে চলবে না। পূর্বোক্ত দুটি বিষয়কে অভিযোগ হিসাবে ধরলে চৈতন্যদেবকেই প্রথম অভিযুক্ত করতে হয়। চৈতন্যদেবকে অনুসরণ করেই ঐ ধারা পরবর্তী বৈষ্ণবদের মধ্যে প্রসারিত ছিল। সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক কারণে ঐ আন্দোলনের উদ্ভব; পরবর্তীকালে নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার তাগিদে চৈতন্য শিষ্যপ্রশিষ্যেরা অনেকে ঐ আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন (দ্র. বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব—ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত)। এ সবই স্বীকার্য। তবুও এর পশ্চাতে যে যুগের দাবী ছিল একথাও ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। স্বভাবতই তাই এর বিরুদ্ধে বিষোদ্গারও সোচ্চার ছিল। 'ইসলামবিপন্ন' বাণীর ধ্বজাবাহী কিছু মুসলমানও এই সমন্বয় প্রচেষ্টা সহ্য করতে পারেন নি। 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকার সম্পাদক মোহম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহম্মদের কণ্ঠে উদ্বেগ ধ্বনিত হয়েছিল: 'হিন্দু-বৈষ্ণব বাউল ভাবাপন্ন অথবা কর্তাভজা দলভুক্ত একশ্রেণীর ফকির নামধারী নরপিশাচ মুসলমানসমাজে কি বিষম বিষরাশি ঢালিয়া দিতেছে তাহা লেখক (আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ) অবগত থাকিলে রাধা কৃষ্ণ নামের স্বরূপ (রাধা=তনু, কৃষ্ণ=মন) অর্থ কখনই করিতেন না। ২৪ পরগণা, নদীয়া,

যশোহর জেলার নেড়া নেড়ীরা বা রসসাধক ফকীর নামধারী নরপশুগণ যে বীভৎস কৃষ্ণলীলার অভিনয় করিতেছে, তাহারা আমাদের সমাজের আবর্জনা বিশেষ।' (ইসলাম প্রচারক, জানুয়ারী ১৯০৩, কর্তাভজা ধর্মমত ও ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮-তে উদ্ধৃত)। অন্যদিকে এই ছত্রিশ জাতের মেলামেশা, শাস্ত্রবিরোধী আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে আর যাঁরা অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন তাঁরা মূলত ছিলেন রক্ষণশীল, নৈষ্ঠিক হিন্দু। আর কর্তাভজাদের এই সংস্কারবিরোধী প্রগতিশীলতার বিরুদ্ধে রক্ষণশীল হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জেহাদের ফসল ঘরে তুলেছিল নবগঠিত খ্রীষ্টান সম্প্রদায় তাও আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি। অভিযোগ বিচারে, সুতরাং অভিযোগের স্বরূপ এবং অভিযোক্তার জাতবিচারও প্রয়োজন।

আলোচনার উপসংহারে এ সিদ্ধান্ত বোধ হয় অসমীচীন নয়—কর্তাভজার বিরুদ্ধে বিরূপ সমালোচনা ধর্মাদর্শের বিরুদ্ধে হলেও মূলত তা সম্প্রদায়েরই বিরুদ্ধে। কর্তাভজার মূল ধর্মমত ও তত্ত্ব এবং এর সম্প্রদায়-কর্তাদের অথবা কিছু কিছু ভক্তের আচরণ—এই দুটি বিষয় সর্বদা অভিন্নপথগামী নয়। মূল্যায়নের সময়ে দুটি ধারার স্বাতন্ত্র্যের বিষয়ে অবহিত না থাকলে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা এড়ানো যাবে না। বস্তুত এই ধর্মমতের বিবর্তনের একটি বিশেষ স্তরে জনৈক সম্প্রদায় কর্তার এবং তৎকালীন সম্প্রদায়ভুক্ত কিছু ব্যক্তির উচ্ছৃঙ্খল আচরণের দায়ভাগ বহন করতে হচ্ছে যুগের প্রয়োজনে উদ্ভূত একান্ত উদার, সমন্বয়কামী এই লোকায়ত ধর্মমতকে।

সংযোজন—২

কর্তাভজাদের গান

কর্তাভজা প্রভৃতি লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায়ের গানগুলি একটি পরম সম্পদ—সম্প্রদায়ের কাছে ত বটেই সর্বসাধারণের কাছেও। লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায়ের সাধারণত কোনো জটিল ধর্মশাস্ত্র থাকে না। বস্তুত এঁরা শাস্ত্রীয় জটিলতার বিরোধী। অথচ সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদির জন্যে কিছু আচার অনুষ্ঠান, নিয়মকানুন থাকেই, কিছু উপদেশ নির্দেশেরও প্রয়োজন হয়। সেইসব উদ্দেশ্য সাধিত হয় এঁদের গানের ভিতর দিয়ে। এগুলি এঁদের সাধনভজনেরও উপাদান। সহজ কবিত্বের সম্প্রদায়-প্রধান বা আর কেউ গানগুলি রচনা করেন। মূল রচয়িতা হয়ত একজন কিন্তু অন্যের রচনাও মূল ভণিতায় চালিয়ে দেওয়া হয়। এইসব লোকায়ত সঙ্গীতগুলির মধ্যে সহজ কবিত্বে ও সার্বজনীন মানবমাহাত্ম্যে লালনফকিরের গানগুলি সর্বাধিক জনপ্রিয়। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি গানগুলির উপব পড়ায় এগুলি বিশেষ গৌরব লাভ করেছে। পরবর্তী-কালে অনেক গবেষক এগুলির সংগ্রহে এবং আলোচনায় মূল্যবান কাজ করেছেন। সাহেবধনী সম্প্রদায়েব গান তেমনভাবে সংগৃহীত বা আলোচিত না হলেও সম্প্রতি প্রকাশিত সুধীর চক্রবর্তীর 'সাহেবধনী সম্প্রদায় তাদের গান' নামক গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা আছে। কর্তাভজাদের গান সম্পর্কে বিশেষ কোনো আলোচনা হয় নি। হয় নি যে তার কারণ সম্ভবত কর্তাভজা সম্পর্কে কিছু বিরূপতা উচ্চশিক্ষিত মহলে প্রচলিত। তাছাড়া গানগুলি লালনের বা সাহেবধনীদের গানের মত পরিপূর্ণ গ্রামীন বৈশিষ্ট্যে ভরা নয়। বরং বলা যায়, কিছুটা সঙ্কীর্ণ অর্থে হলেও এক ধরণের urban বৈশিষ্ট্য এর বেশিরভাগ গানে বিদ্যমান। কর্তাভজাদেব ভক্তশিষ্যমণ্ডলীর অতি বৃহৎ অংশ গ্রাম্য নরনারী হলেও 'এদেব প্রধান শিষ্যেরা ছিলেন কলকাতাবাসী' (দ্র. পদাবলীর অভিসার: গানের শ্রীক্ষেত্রে; সুকুমার সেন। অতঃপর প. অ.)। সম্প্রদায় মধ্যে এঁরাই ছিলেন প্রভাবশালী। এটাই মনে হয় urban বৈশিষ্ট্যের উৎস। অবশ্য urban হলেও তা একান্তই সহজ সরল আন্তরিক। রেলগাড়ী প্রভৃতি রূপকল্পের নাগরিক উপাদান সাহেবধনীদের গানের মধ্যেও আছে। কিন্তু তার সামগ্রিক গ্রামীন বৈশিষ্ট্য দুর্লক্ষ্য নয়। তাই এঁদের অনেক গান বাউল গান হিসাবে চলে আসছে। কিন্তু কর্তাভজাদের ক্ষেত্রে তেমন হতে পারে নি। সম্প্রদায়ের বাইরে এর প্রচার নেই। গানগুলি কেবল ঘোষ-পাড়ার দোল মেলাতে বা পারিবারিক বৈঠকে গীত হয়। বাউলদের সঙ্গে কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকলেও কর্তাভজারা গৃহস্থ, ভিক্ষাবৃত্তি নেই এঁদের। (প. অ. পৃ. ২৭)। ভিক্ষাবৃত্তি থাকলে ভিক্ষাটনে ব্যাপক প্রচার লাভ করত।

কারণ যাইহোক, গানগুলি বর্তমানে খুব দুর্লভ না হলেও এর সম্পর্কে বিশেষ কোনো আলোচনা হয় নি একথা সত্য। এমন কি যাঁরা এঁদের সম্পর্কে গ্রন্থাদি রচনা / সম্পাদনা করেছেন তাঁরাও এগুলির উপর তেমন নজর দেন নি। অথচ এগুলি সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি এবং বিশ্লেষণযোগ্য বিষয়ের অভাব নেই। কবিত্বগুণেও গানগুলি নিকৃষ্ট নয়। ড. সুকুমার সেন সংক্ষিপ্ত হলেও তাঁর কর্তাভজাদের কথা ও গান নামক প্রবন্ধে (বিশ্বভারতী পত্রিকা ১০ম বর্ষ ১ম সংখ্যা) এগুলির মূল্যবান আলোচনা করেছেন এবং এর কবিত্বের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। বাংলা গানের ধারাবাহিকতায় এই গানগুলির যে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে তারও উল্লেখ তিনি করেছেন। (দ্র. প. অ.)।

কর্তাভজা ধর্মমতের প্রবর্তক আউলেচাঁদ এবং সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতা তাঁর শিষ্য রামশরণ পাল। কিন্তু গানগুলির মুখ্য রচয়িতা এঁরা কেউ নন,—রামশরণের পুত্র রামদুলাল বা দুলালচন্দ্র পাল। (অন্যের রচনাও আছে তবে এঁর নামেই চলে। সে আলোচনা পরে)। সম্প্রদায়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন রামশরণের হাতে হলেও এর ব্যাপক প্রচার এবং সত্যকার প্রতিষ্ঠা দুলালচাঁদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। তাঁর আর একটি বিশেষ দান গানগুলির রচনার সূত্রপাত। এগুলি কর্তাভজাদের গীতাবলী, ভাবেরগীত ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত হলেও এগুলির একটি বিশিষ্ট নাম শ্রীশ্রীযুতের পদ। সম্প্রদায় মোহান্ত হিসাবে রামদুলাল ভক্তশিষ্যদের মধ্যে শ্রীযুত নামে অভিহিত হতেন। সেকারণেই গানগুলির উক্ত অভিধা। গানগুলিই এঁদের একমাত্র লিখিত শাস্ত্র। চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থাদি এঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গেই পাঠ করেন। কিন্তু এঁদের নিজস্ব শাস্ত্র বলতে এই গানগুলি। সম্প্রদায় মধ্যে এগুলি তাই আইন পুস্তকরূপেও পরিচিত।

গানগুলির মুখ্য এবং প্রথম রচয়িতা রামদুলাল। কথিত আছে আঠারো বছর বয়স থেকে ইনি ভাবের ঘোরে গানগুলি বলে যেতেন এবং তাঁর শিষ্য পার্ষদ,—রামচরণ চট্টোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য, কাশীনাথ বসু, রামানন্দ মজুমদার, নীলকণ্ঠ মজুমদার (শেষ দুজন ভাগিনেয়) প্রভৃতি সেগুলি লিখে নিতেন। প্রথমত গানগুলি এঁদের ও অন্য কিছু ভক্তশিষ্যের খাতাতেই আবদ্ধ ছিল। দুলালচাঁদের গানগুলি ১৮৩৩-এর মধ্যেই রচিত কারণ এঁর জীবৎকাল ১৭৭৬ থেকে ১৮৩৩ (আনুমানিক)। গানগুলি মুদ্রিতরূপে প্রকাশিত হয়েছে। অনেক পরে। সুকুমার সেন জানিয়েছেন ১৮৭০ সালে কর্তাভজাদের গীতাবলী নামে এঁদের গানের একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। পুথি সংগ্রাহক ছিলেন নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী। গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়েছিল '৩১৯ নং চিৎপুর

রোড বটতলায় মধুসূদন শীলের চৈতন্য চন্দ্রোদয় যন্ত্রে।' (প. অ. পৃ. ৪৩)। এটিই সম্ভবত এই গানের প্রথম মুদ্রিত রূপ। এর বছর দুই পরে ১২৮৯ বঙ্গাব্দে রমেশচন্দ্র ঘোষের প্রচেষ্টায় ভাবের গীত নামে এই গানগুলির একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় প্রকাশিত শ্রীশ্রীযুতের পদ-এর প্রকাশকাল ১৩১৯ বঙ্গাব্দ। মনুলাল মিশ্রের ভাবের গীত প্রকাশিত হয়েছিল ১৩১৩ বঙ্গাব্দে। এর ২য় সংস্করণ হয়েছিল ১৩১৯এ ৪র্থ (রাজ) সংস্করণ ১৩৮৪-তে। এটিই এখন কিছুটা সহজলভ্য। অন্যগুলি কোন কোনো ভক্তের ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকতে পারে, দুষ্প্রাপ্য। যাইহোক, ১৮৭০-এর আগে এর কোনো মুদ্রিত রূপ ছিল বলে মনে হয় না। এর আগে কারো কারো রচনায় এঁদের গীতিসংগ্রহের যে উল্লেখ আছে তা সম্ভবত হাতে লেখা খাতা।

গানগুলিতে ভণিতা আছে লালশশী বা শশীলাল যেমন: লালশশী বলে ঘরের সন্ধানে কেমনে বধলে দশানন অথবা আর শশীলালে হেসে বলে বসিয়ে গণিতে। ইত্যাদি। দুলালচাঁদ-এর দু- বাদ দিয়ে লালচাঁদ, তার থেকে লালশশী। এইভাবেই শব্দটির উৎপত্তি। লালশশী উল্টিয়ে শশীলাল। কখনোবা কেবল শশীও ব্যবহৃত—এমন ভণিতাযুক্ত গানের সংখ্যাও প্রচুর। আবার কিছু গানের শেষে শশী শব্দটি এমনভাবে ব্যবহৃত যা ঠিক নাম বোধক নয়। তবুও কিন্তু তা ভণিতা, যেমন, শশী নিশি বিনে আসি প্রকাশি কোথায় তবে। বহুগানে আবার ভণিতা নেই।

শশী নামাঙ্কিত থাকলেই সবগুলি গান যে রামদুলালের রচনা তা কিন্তু নয়। বেশ কিছু গান পরবর্তী ভক্তশিষ্যের রচনা কিন্তু শশী ভণিতাযুক্ত। ঠিক কোনগুলি রামদুলালের রচনা তা নির্ণয় করা দুরূহ। তবে অনুমানভিত্তিক কিছু আলোচনা করা চলে।

যে গানগুলিতে ভণিতা নেই প্রথমে সেই গানগুলির রচয়িতা সম্পর্কে সন্দেহ করা চলে। উদাহরণত, আইনে দৃষ্টি রেখে চল অতি হর্ষ মনে·····ইত্যাদি গীতিটির উল্লেখ করা চলে (মনুলাল মিশ্রের ভাবের গীত ৪র্থ সং পৃঃ ৪০১; শ্রীশ্রীযুতের পদ ২য় ভাগ পৃঃ ৩৬৮। অতঃপর যথাক্রমে ভা. গী. এবং শ্রী. প রূপে লিখিত। আমরা বেশিরভাগ উদ্ধৃতি ভাবের গীত থেকেই দেব কারণ গ্রন্থটি অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য।) বিষয়বস্তুর কিঞ্চিৎ পার্থক্য এবং গানটির মধ্যে ১২৫৯ সালের উল্লেখে (এই বঙ্গ শকের বারশত উনষাট সালে ইত্যাদি) সহজেই অনুমান করা চলে গানটির রচয়িতা লালশশী নয় কারণ ঐ সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন না। গানটির শেষে, ভাইরে ঠাকুরমণি কল্লে এই নিশানি—এমন উল্লেখ আছে। ঠাকুরমণি কে? শ্রীশ্রীযুতের পদের মুখবন্ধনে ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'ঠাকুরমণি দুলালচাঁদের জ্ঞানচক্ষু প্রদান করেন;

কিন্তু এই গীতে ঠাকুরমণি নামোল্লেখের সার্থকতা সুবোধ্য নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য আর দু একটি গানেও সন তারিখের উল্লেখ আছে যেমন, সন বারশত একত্রিশ আষাঢ়ী পর্বে, শুক্লা চতুর্দ্দশীর মহামহোৎসবে (ভা. গী. পৃ. ১৩৯) অথবা, গত ফাল্গুনেতে বারশত পৈত্রিশ সালে (ঐ পৃ: ৩০৫) দুটিতেই লালশশীর ভণিতা এবং দুটিই তাঁর জীবৎকালের মধ্যে।

দুলালচাঁদের লেখা নয় বলে অনুমিত আর একটি গীত :

বটপত্রশায়ী, জগৎবনাই, আপনে ত্রিগুণ নেহারি।
ত্রিভুবন সৃজন, পালনতারণ, কারণ নাম বিচারি॥
ব্রহ্মপরাৎপর, হে পরমেশ্বর, মুরহর কেশব শৌরি।
আদি পুরুষ সুখ, মেয় দুঃখভঞ্জন, পুঞ্জন রঞ্জন কারী॥
নারায়ণজন, জীবনভাজন, গোলোক ধাওঁ বিহারী।
ভকতযুতরত, কতসুখ ভাঁওত লেওত ভারত উদ্ধারি॥ ইত্যাদি

মোট ষোলো পংক্তির এই গীতে কোনো ভণিতা নেই। কিন্তু তার থেকেও বড় কথা কিঞ্চিৎ ব্রজবুলির আভাসযুক্ত এই ভাষাভঙ্গি ছন্দমিলনের সঙ্গে লালশশীর গানের কোনো সাদৃশ্য নেই। গীতিটির শীর্ষে ভজন শব্দটি লিখিত বা ভাবের গীতে অনুরূপ সন্দেহজনক আর ৭/৮টি মাত্র গীতে আছে।

নামমহিমা বিষয়ক কয়েকটি গীতও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গঠনভঙ্গি ও ভণিতা দেখে পার্থক্য বোঝা দুরূহ। কিন্তু অন্য পার্থক্য গুরুতর। গানগুলির দৈর্ঘ্য অনেক বেশি। সাধারণত গীতগুলি তিন, চার কলিতে (স্তবকে) গঠিত। কিন্তু পূর্বোক্ত গীতগুলি ১৩/১৪ কলির। তাছাড়া গানগুলির ভাষাভঙ্গি রীতিমত তৎসম ঘেঁষা, যা লালশশীর আরবি ফারসি ইংরেজি মেশানো চলিত ভাষাভিত্তির উপর গঠিত রীতির সঙ্গে একেবারেই মেলে না। একটু উদাহরণ দিই : (প্রথমে লালশশীর রচিত বলে অনুমিত গীতের অংশ, পরে অন্য গীতের অংশ উদ্ধৃত।)

১। হায়রে কি তোফা সব এসেচে, / আসতে আসতে খোস বায়েতে এদেশ মেতেছে, / এমন মজা তোফা ভাই কে কোথা দেখেছে, / কাপ্তেনেরা আপনার নজরে বেচতেছে দফায় দফায় / নিচ্ছে দোকান-দারে, / এই আসলে নকলে তারা দোকান খুলে বসেছে।
এই জাহাজ দুনী কোম্পানীর আছে দেখা শুন, / এমন আমদানীরে তাই হয়নিকো কখন. / খোস বাসেরা কচ্ছে আনাগোনা. / যাচতে চায় কোথায় কত পায়নাকো ঠিকানা, / সেই তোফার আশাতে, / তারা পিছে পিছে ফিরতেছে। (ভা. গী. পৃ. ৬৩-৬৪)।

২। ওরে রসনা মত্ত হও নাম রস পানে, / রসনা শ্রীগুরুর পদারবিন্দ, / তাতে আছে মকরন্দ / ধারণ কর আনন্দ মনে, / ভয় যায় যার স্মরণে, / ধড়ে আছে প্রাণরে যতক্ষণ, / নিত্য কীর্তনে রত হওরে ততক্ষণ, / ওরে কালেকে কাল আসিবে, / ভাবলে না তার কি হবে / ক্ষমা নাইরে ও নাম বিনে।

শুন শুন ওরে দুরাচার মনরে আমার / বলি তোমারে পার হবার কি ভেবেছ এই ভব কারাগারে, / অনিবার নিবারিবে যে, / তারে কেন মনরে আমার ডাকনা বুঝে, / ওরে শুন মহতের কথা, / হয়না যেন অন্যথা, / দেখ দেখ থেক চেতনে। (ভা. গী. পৃ. ৪৪২)।

ভাবের গীত-এ নামমহিমাসূচক গীতিগুলি (সংখ্যা ৭টি) ভজন শীর্ষনামের অন্তর্গত। যাঁদের নামের মহিমাকীর্তন করা হয়েছে সেই নামাবলীর মধ্যে আছে—হরি, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, হনুমান, শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, ষড়গোস্বামী, আনন্দময়ী, কালী, তারা, শ্রীগুরু প্রভৃতি সব। এ ছাড়া শ্রীশ্রীযুতের পদ-এ কৃষ্ণকবির গান শীর্ষক ১২৩টি গীত আছে। ভাবের গীত-এ অনুরূপ গানগুলি কৃষ্ণলীলা শীর্ষক, তবে সংখ্যা ৭৩টি। এর মধ্যে আবার প্রভাতী গোষ্ঠ, জন্মাষ্টমী, রাসলীলা, বড়াই কুটিলের দ্বন্দ্ব অন্তর্ভুক্ত। এই শেষোক্ত অংশে কৃষ্ণের দানলীলা প্রভৃতি এবং বড়াই-এর কীর্তিকাণ্ডের আভাস আছে। এইসব গান পরবর্তী রচনা বলে অনুমান হয়। এছাড়া গৌরাঙ্গলীলা নামে একটি শীর্ষক আছে। গানের সংখ্যা ১২। অন্যত্রও অবশ্য গৌর / চৈতন্য নাম আছে। আউলচাঁদকে গৌরচন্দ্রের অবতার মনে করা হয়। তাই গৌরনামে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু এমন অবিমিশ্র গৌরাঙ্গ বিষয়ক গান বোধহয় প্রথম দিকে ছিল না। পরবর্তী সংযোজন বলেই মনে হয়।

আগেই বলেছি এসব সন্দেহ অনুমানভিত্তিক। তবে অনুমান মিথ্যা নাও হতে পারে। কিন্তু এর উপর নির্ভর করে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া চলে না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য অন্য ভক্তেরা গান রচনা করে লালশশীর ভণিতা দিয়ে চালাতেন এ তথ্যটি পূর্বেও অজ্ঞাত ছিল না। ১২৮৯ সালে প্রকাশিত ভাবের গীতের ভূমিকায় রমেশচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন, 'এতদ্ব্যতিরেকে ঠিক কোনগুলি লালশশী রচিত তাহা স্থির করা অতিশয় দুরূহ ; কারণ অন্য ভক্ত মহাত্মারা তাঁহাদিগের স্ব স্ব রচিত গীতগুলিতে লালশশীর ভণিতা দান করিয়াছেন।' (রত্নকুমার নন্দী : কর্তাভজা ধর্ম ও সাহিত্য ; পৃঃ ১১১-তে উদ্ধৃত)। 'পূর্বে বট-পত্রশায়ী ··ইত্যাদি যে গীতটির উল্লেখ করেছি শ্রীশ্রীযুতের পদ-এ তার পাদটীকায় তারকা চিহ্নিত করে মহাজনী পদ বলা হয়েছে। এমন আরো কয়েকটি গান আছে। মহাজনী পদ বলতে অন্য কবির রচনা। অনুরূপ ঢেউপদ। যাই হোক, কিছু গান নিশ্চয়ই অন্য কবির রচনা। তার সংখ্যা মনে হয় খুব কম নয়।

লালশশীর রচনা না হলেও এগুলিও নিশ্চয়ই কর্তাভজাদের গান। এসব কবির নাম জানতে পারলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁদের স্বতন্ত্র উল্লেখ অবশ্যম্ভাবী ছিল। দুঃখের বিষয় তা বোধহয় আর সম্ভব নয়। এই সম্প্রদায়ের গানগুলির মুদ্রিত সংস্করণের নাম তাই কর্তাভজাদের গীতাবলী সব থেকে সুপ্রযুক্ত অভিধা। ভাবের গীত নামেও অব্যাপ্তি নেই। শ্রীশ্রীযুতের পদ কিঞ্চিৎ বিভ্রান্তিকর।

রচয়িতা যিনিই হোন গানের সংখ্যা কত? সুনির্দিষ্টভাবে বলা দুরূহ। মুদ্রিত সংগ্রহ গ্রন্থগুলির মধ্যে সংখ্যার তারতম্য আছে। আবার একই সংগ্রহ গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা, অর্থাৎ গানের গ্রহণ বর্জন ঘটেছে। শ্রীশ্রীযুতের পদ-এ গীতিসংখ্যা ৬৬২। সূচীপত্র দেখে সংখ্যা নির্ণয় কষ্টকর। কারণ একই গীতের একবার চিতেনের (২য় স্তবকের) আবার মোহড়ার (প্রথম স্তবকের) সূচী আছে। আখ্যাপত্রে লেখা আছে, '১ম, ২য়, ৩য় ভাগে মোট ৬৫০ ও অন্য ২০টি পদ' আছে। উক্তিটি নির্ভুল নয়। ভাবের গীত-এ ৪র্থ সংস্করণে ৫৮৭টি গীত আছে। অর্থাৎ শ্রীশ্রীযুতের পদ-এর তুলনায় ৭৫টি কম। একমাত্র কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গানের ক্ষেত্রে এই কমের সংখ্যা ৫০, বাকী ২৫টি অন্যত্র। সুকুমার সেন কর্তাভজাদের গীতাবলী নামক যে সংগ্রহগ্রন্থের উল্লেখ করেছেন তার গীতিসংখ্যা জানান নি। অন্যত্র তিনি বলেছেন গীতি সংখ্যা পাঁচ শতাধিক। মুদ্রিত গানের সংখ্যা পাঁচ কেন ছয় শতেরও অধিক। এছাড়াও কোন ভক্ত শিষ্যের নিজস্ব সংগ্রহে (স্বরচিত?) কিছু গান থাকাও সম্ভব। এর মধ্যে লালশশীর গানের সংখ্যা কত জানতে পারলে ভালো হত। তা আর সম্ভব নয়। আপাতত, মুদ্রিত সংগ্রহ গ্রন্থে যে গানগুলি আছে তাই আমাদের আলোচনার ভিত্তি।

আগেই বলেছি, গানগুলি লালশশীর নিজের হাতে লেখা নয়। যাঁরা লিখে নিতেন তাঁদের ভুল হওয়া অসম্ভব নয়। পরেও আবার—ভুল হত, একজনের খাতা থেকে আর একজন যখন নকল করতেন। কোন স্থানে কোনো শব্দ বুঝতে না পারলে তারা নিজের পরিচিত শব্দ বসিয়ে দিতেন। ফলে রীতিমত পাঠভেদ ঘটে যেত। প্রথম থেকেই প্রকাশকেরা বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। শুদ্ধপাঠ নির্ণয়ের জন্যে চেষ্টাও করেছেন তাঁরা। তবে সাফল্য সম্পর্কে নিজেরাই নিঃসন্দেহ নন। পাঠ-ভেদ মাঝে মাঝে বেশ গুরুতর। অর্থসঙ্গতি নিয়েই সন্দেহ দেখা দিয়েছে। একটু নমুনা দিই। সুকুমার সেন পদাবলীর অভিসার: গানের শ্রীক্ষেত্রে—পুস্তিকায় দুটি কর্তাভজা সঙ্গীত উদ্ধৃত করেছেন। অন্যত্র গানের যে পাঠ আছে তার সঙ্গে এর পার্থক্য বিস্তর। ড. সেন সম্ভবত কর্তাভজাদের গীতাবলী থেকে গান দুটি উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর দেওয়া একটি গান নিম্নরূপ:

১. কিন্তু ভাই মনের মানুষ চিন্তে পারিনে।
২. আমি ওক্তে বসে ফিরছি ভাই তল্লাসে,
৩. সকলকে দেক্তে পাচ্ছি এখানে
৪. হবে কি ভাই ভাবিতেছি শয়নে স্বপনে।
৫. আমি আপ্না হতে কোন মতে বুদ্ধিমন্ত নই,
৬. দেখতে যে না পায় সাক্ষাতে দেখিয়ে বলে ঐ
৭. আর আসমানেতে পাখি ওড়ে আমি পাখা দিই গুণে॥
৮. দেখ যে অবধি কল্লে বিধি পৃথ্বী সৃজন।
৯. অনাদি আদি গুণের নিধি তদবধি হন মনোরঞ্জন
১০. আমি অন্তধরে তন্ত্র সারে মন তোরে বুঝাই,
১১. দেখলে না ফের কোন কালে ফের বলে দেক্তে পেলাম তাই,
১২. মোনের আষ্টে পৃষ্টে ললাটে যা দেক্তে পাচ্ছি এক্ষণে॥
১৩. একদিন এই মানুষের তল্লাসে দেশ বিদেশ ঘুরে।
১৪. এক তামাসা দেক্তে পেলাম খাসা দশ দশারে
১৫. মনিমুক্ত প্রবাল রত্ন কত জাহাজ বোঝাই,
১৬. কর্তা গিয়েছে কোথা মালাত্তা খোই কিছু তার নাই,
১৭. যে লোক সওদা সুলুক কোর্ত্তে মূলুক আসিছে জাহাজে
১৮. আপ্নি তার রকম চিনি সে জিনিস দিই তারে বুঝে
১৯. কত বিশ মোন চিজ বিশকে উনিশ এক নিমিষে দিই চিনে।
২০. এক অগ্রদ্বীপের মহোৎসবে দেক্তে গেলাম একা
২১. আকড়াধারী কত পুরুসনারি হয় লেখা জোখা।
২২. হলো দেখতে গিয়ে বারেক চেয়ে আপ্নাকে ভুল
২৩. বোলব কি ভুল হোয়ে দেখি বাদিল আর তুল,
২৪. আদি অন্ত ধোরে তন্ত্র সারে মন্ত্র বিচক্ষণ,
২৫. অগ্নি সে গুণমণি তখন কোল্লেন স্মরণ,
২৬. যা হারিয়েছিলাম ধোত্তে গেলাম দেক্তে পেলাম দর্পণে।
২৭. লালশশী বসে যা হারিয়েছিলাম ধোত্তে গেলাম দেক্তে পেলাম দর্পণে॥

(প. অ. পৃ. ৪৩)

(আলোচনার সুবিধার জন্যে বাঁদিকের পংক্তি সংখ্যা আমার সংযোজন)

ভাবের গীত এবং শ্রীশ্রীযুতের পদে এর পাঠ বেশ অন্যরকম। কয়েকটির উল্লেখ করছি। ২য় পংক্তির ওক্তের স্থানে তক্তে, ১০ম পংক্তির পাঠ, আদি অন্ত ক'রে তন্ত্র ধ'রে মন তোরে দেখাই, ১৬শ পংক্তির খোই স্থানে বই, ১৯শ পংক্তির বিশ মোন চিজ স্থানে বেশ মূল্য চিহ্ন, ২১শ পংক্তির হয় লেখা জোখা স্থানে হয় না লেখা জোখা, ২৩শ পংক্তির বুঝি বাদিল আর তুল স্থানে আজ বুঝি বাধল

আরস্তল, ২৪শ পংক্তির আদি অন্ত ধ'রে তন্ত্রসারে মন্ত্র বিচক্ষণ স্থানে জানি আদ্যপান্ত অবিশ্রান্ত মনত বিচক্ষণ। শেষ দুই পংক্তির ধোত্তে গেলাম স্থানে বর্তে গেলাম। এছাড়াও পৃথ্বী = পৃথিবী, পেলাম = পেলেম, আপনাতে = আপনাকে —এমন পার্থক্য অনেক আছে। গীতিটির স্পষ্ট অর্থ বোধগম্য নয় তাই শুদ্ধপাঠ নির্ণয় দুরূহ। তবুও ১০ম, ১৪শ প্রভৃতি পংক্তির ভাবের গীত-এর পাঠ শুদ্ধতর মনে হয়। ২১শ পংক্তির পাঠভেদ কিঞ্চিৎ গুরুতর। একপাঠে অন্ত্যর্থক বাক্য অন্যপাঠে নঙর্থক। ২৩শ পংক্তির আর তুল এর অর্থ সুকুমার সেন ধরেছেন অন্য তুলাদণ্ড। জাহাজ, মালপত্র ইত্যাদি প্রসঙ্গে অর্থটি অসঙ্গত নয়। কিন্তু আরস্তল শব্দটির প্রয়োগ ভাবের গীত-এ অন্যত্রও আছে।

নারীর কুলে এ আরস্তল,
মন ভুলায়ে বঁধু হলেন ডুম্বুরের ফুল (পৃ. ৫৬)

শ্রীশ্রীযুতের পদে এর পাঠ: নারীর কুলে এত আর স্থু-ল্ (পৃঃ ৬০, ১ম ভাগ)। আরস্তল মানে কি জানি না। আর তুল শুদ্ধপাঠ হতে পারে। শেষ দুটি চরণ উভয়তই ভুল মনে হয়। গীতিটি মনের মানুষ তত্ত্ব সম্বলিত। সেই মনের মানুষকে সাধক প্রথমে চিনতে পারে নি। পরে নিজের মনেই (দর্পণে) তাকে পেলেন, বর্তে গেলেন। তাই শেষ দুটি চরণের শুদ্ধপাঠ হতে পারে:

যা হারিয়েছিলাম ধোত্তে গেলাম দেখতে পেলাম দর্পণে।
লালশশী বলে বর্তে গেলাম দেখতে পেলাম দর্পণে॥

৪

গানগুলির পাঠে পার্থক্য থাকলেও গঠনভঙ্গি কিন্তু একরকম। এর থেকে কর্তাভজাদের গানের গঠনভঙ্গি অনুমান করা চলে। প্রথমেই চোখে পড়ে সওয়াল জবাবে এগুলি লেখার রীতি। অর্থাৎ প্রথমে একটি গানের শীর্ষে সওয়াল শব্দটি লিখিত, পরবর্তী গীতি-শীর্ষে জবাব। এই রীতি প্রায় আনুপূর্বিক। ব্যতিক্রম প্রায় নেই বললেই চলে। পূর্বে বটপত্রশায়ী ·· ইত্যাদি যে গানটির-উল্লেখ করেছি তার উপরে সওয়াল বা জবাব কিছুই নেই। ভাবের গীত ৪র্থ সংস্করণে গানগুলির শ্রেণীবিভাগ করে কিছু শীর্ষনাম দেওয়া আছে। বসন্তবাহার শীর্ষক গানগুলিতে কেবল সওয়াল আছে জবাব নেই। সওয়ালগুলি সংখ্যাত। কোথাও ৫/৬টি পর্যন্ত সওয়াল পরপর সন্নিবিষ্ট পুনরায় ১, ২ ইত্যাদি। এর তাৎপর্য অনুধাবন দুরূহ। যাই হোক, সামান্য ব্যতিক্রম সত্ত্বেও গানগুলির সাধারণ রীতি সওয়াল জবাব ধরণের।

গীতিশীর্ষে সওয়াল জবাব লেখা থাকলেও এগুলি কিন্তু ঠিক প্রশ্নোত্তর

মূলক নয়। সওয়ালে সোজাসুজি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নি, জবাবে তার উত্তর নেই। কদাচিৎ প্রশ্নোত্তরের সামান্য আভাস থাকলেও আসলে সওয়ালে যে ভাব বা বক্তব্য উপস্থাপিত জবাবে তার ব্যাখ্যা বা সম্প্রসারণ। তাই সওয়াল ও জবাবকে স্বতন্ত্র ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ গীতি হিসাবে ধরলেও অসুবিধা হয়না। যাইহোক, স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে এই রীতির উৎস কী? অনেকে অনুমান করেন কবিগানের প্রভাবে এই রীতির উদ্ভব। এ অনুমান খুব যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। কর্তাভজাদের গানে অন্য কোনো কোনো দিকে কবিগানের কিছু প্রভাব থাকলেও এই রীতির উদ্ভবে কবিগানের প্রভাব নেই। আগেই বলেছি ঠিক প্রশ্নোত্তর মূলক এই গানগুলি নয়। তাছাড়া কবিগানের প্রভাবে হলে চাপান উতোর নাম হতে পারত। অনেকে অনুমান করেন এই রীতির উৎসে সুফী প্রভাব আছে। সুফীদের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত। সুফী গুরুরা তাঁদের ধর্মের বাণী শিষ্যের সওয়ালের জবাব হিসাবে রচনা করতেন (দ্র. Sufism : A. J. Arberry)। কর্তাভজা ধর্মমতের উদ্ভবে এবং সাধনপদ্ধতিতে সুফী প্রভাবের কথা সবাই স্বীকার করেন। গানের গঠনেও সুতরাং সে প্রভাব স্বাভাবিক। বিশেষত শব্দদুটি সওয়াল জবাব ; চাপান উতোর বা প্রশ্ন উত্তর নয়, এ বিষয়টিও লক্ষণীয়।

প্রথমদিকে মনে হয় কর্তাভজাদের গান তিনটি কলিতে (স্তবকে) গঠিত হত। সংগ্রহ গ্রন্থগুলিতে তিন কলি সাট বা তিন কলি গীতের স্বতন্ত্র উল্লেখ আছে। অতঃপর বেশির ভাগ গান চার কলির। পাঁচ বা তদধিক কলিরও কিছু গান আছে তবে তার সংখ্যা খুব বেশী নয়। সওয়াল ও জবাবে গানের দৈর্ঘ্য সমান। কদাচিৎ এর ব্যতিক্রম দেখা যায়।

গানগুলিতে ভণিতা থাকতো। ভণিতায় কবিনাম প্রসঙ্গ আগেই উল্লেখ করেছি। ভণিতা রচনার একটি বিশেষ রীতির দিকে এবার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। প্রায়শ দেখা যায় ভণিতার শেষ দুটি চরণে শব্দাবলীর কিছু পুনরাবৃত্তি করেছেন রচয়িতারা কখনো পূর্ণত কখনো অংশত। যেমন :

মালিকের হুকুমে ভক্তগণ সে ভগবতে,
লালশশী বলে মালিকের হুকুমে সে ভক্তগণ সে ভগবতে।

অথবা, কেউ গল্পগুজব করতে গেলে, বোঝে তারা উপহাস,
লালশশী বলে আসল না হলে করে তারা উপহাস।

অবশ্য কদাচিৎ এ রীতির ব্যতিক্রম ঘটেনি তা নয়। এই ব্যতিক্রমের মধ্যে রচয়িতা দুলালচাঁদ না অন্য কেউ সে রহস্য লুকিয়ে থাকা অসম্ভব নয়।

৫

গানগুলিতে কোনো রাগ তালের উল্লেখ নেই। লালনফকির বা সাহেব-

ধনী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের গানেও রাগতালের উল্লেখ নেই। তখনকার দিনের বিভিন্ন কবি সঙ্গীতে কিন্তু প্রায়শ রাগতালের উল্লেখ থাকতো। সেদিক দিয়ে গীতরীতিতে এই গানগুলি অনেক বেশি লোকায়ত। বৈঠক করে সমবেত-ভাবেই এগুলি গাওয়া হয়। 'সঙ্কীর্ত্তনের মত গানের মেলা।' (প. অ. পৃঃ ২৭)। সঙ্কীর্তনের মত হলেও মার্গসঙ্গীতের দুরূহতা থেকে একান্তই দূরবর্তী—সহজ সুরের গান। গীতরীতির সামান্য ইঙ্গিত শ্রীশ্রীযুতের পদের সূচীপত্রে পাওয়া যায় চিতেন, মোহড়া প্রভৃতি শব্দের উল্লেখে। সুরের টানের কিছু ইঙ্গিত বানান প্রবৃত্তির মধ্যেও লক্ষণীয়।

যে সময়ে এই গানগুলি রচিত হয়েছিল তখন বাংলাদেশে বিশেষত কলকাতা অঞ্চলে কীর্তনের বাইরে যেসব গান প্রচলিত ছিল তাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, কালোয়াতি আর দেশি। জয়নারায়ণ ঘোষাল তাঁর করুণা নিধান বিলাস-এ (১৮২০) তৎকাল প্রচলিত বিভিন্ন সঙ্গীত ধারার একটি বিরাট তালিকা দিয়েছেন (দ্র. প. অ. পৃঃ ৩২)। এই তালিকার সব রীতির গানের পরিচিতি সুনির্দিষ্ট করা দুরূহ। তবে এই তালিকা এবং পরবর্তী সংস্কৃতির নিদর্শন মিলিয়ে বলা চলে তখন দেশি গানের দুটি ধারা প্রচলিত ছিল। প্রথম ভক্তি-রসের গান এবং দ্বিতীয় নিতান্তই লৌকিক, এমনকি অনেকাংশে অশ্লীল—খেউড় (খেড়ু), কবি, তরজা, শাড়ি (শারি ?) প্রভৃতি। প্রথম ভাগের মধ্যে পড়ে রামায়ণ, শক্তির গান (মালসী), শিবের গান (মায়ূরী), গোবিন্দ-মঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল, কর্তাভজা প্রভৃতি এবং কিঞ্চিৎ পরবর্তী ব্রাহ্মসঙ্গীত।

কোনো কোনো সঙ্গীতে ভক্তি ও লৌকিকতার মিশ্রণও ঘটেছিল। তবে অশ্লীলতা কিন্তু সব গানে ছিল না যদিও কলকাতায় জেগে ওঠা হঠাৎ বাবুদের আসরে অশ্লীলতার কদর তখন ছিল প্রচুর। কর্তাভজাদের গানে লৌকিক গীতরীতির বেশ প্রভাব আছে, কিন্তু এগুলি মূলত ভক্তিরসের গান। এতে লৌকিকতার উপাদান মিশেছে প্রচুর—সে লৌকিকতা শহুরে বাস্তব জীবনের কেনা, বেচা, জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিক, কখনো বা অশিক্ষিত নারীসুলভ কোন্দল। এইসব রূপকের আড়াল দিয়ে ভক্তির কথাই ব্যক্ত। কিন্তু কোথাও এই লৌকিকতা অশ্লীলতার সীমা স্পর্শ করে নি। ব্রাহ্মসঙ্গীতের মত অত sophisticated না হলেও এই দিকে ব্রাহ্মসঙ্গীতের সঙ্গে এর মিল লক্ষ্য করা যায়। আর একটি দিকেও ব্রাহ্মসঙ্গীতের সঙ্গে এর মিল আছে—তা হল, মেয়ে পুরুষ এক সঙ্গে মিলে বৈঠক করে গাওয়া—একেই হয়ত সুকুমার সেন বলেছেন, 'আচরণে অনেকটা খ্রীষ্টানী ভাব' (প. অ. পৃ. ২৭)।

৬

কর্তাভজারা সহজিয়া। তাই এঁদের গানেও সহজিয়াসুলভ হেঁয়ালির আড়াল দিয়ে বক্তব্য উপস্থিত করার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। হেঁয়ালি রীতি

থাকলেও এগুলি একান্ত দুর্বোধ্য নয়। আড়াল সৃষ্টির প্রচেষ্টায় একটি লক্ষণীয় বিষয়, সওদাগরি, ব্যবসা বাণিজ্য, খরিদ্দার, দোকানদার, কোম্পানী, আমদানী রপ্তানী, সওদা, মুনাফা প্রভৃতি শব্দাবলীর ব্যবহার প্রচুর। প্রত্যেকটি চরণের সুনির্দিষ্ট অর্থবোধ করা না গেলেও মূলভাবটি মোটামুটি বুঝে নেওয়া যায়। কতকগুলি গীতে আড়ালটি বেশ আবছা—অল্প আয়াসেই অর্থ স্পষ্ট হয়ে যায়। অল্প কিছু সংখ্যক গানে হেঁয়ালি একেবারেই নেই। এই হেঁয়ালি রীতির ক্রম-ক্ষীণতা সম্ভবত গানগুলির রচনাকালের বিবর্তন সূচক।

হেঁয়ালি সত্ত্বেও গানগুলির মধ্যে সহজ সরল কবিত্ব এবং একটি অকৃত্রিম আন্তরিকতার সুর সহজেই মন কাড়ে। ছন্দ মিলের চেষ্টা, অলঙ্কারের মধ্যে অনুপ্রাসের আপেক্ষিক বাহুল্য নিশ্চয়ই চোখে পড়ে যেমন,: ভয় করি ভাই এ ঘোর পাথারে / আসতে পাছে হয় ফিরে / এ পারে সে পারে বারে হে বারে / অবিশ্রান্ত গমনাগমন, / অন্ত যদি হয় তখন, / তবে ক্ষান্ত পেয়ে শান্ত হয়ে / যাইতো সে দেশান্তরে। (ভা. গী. পৃ. ৬)। কিন্তু তাই বলে তৎকালীন কবিসঙ্গীতের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ যে-অভিযোগ করেছিলেন, 'ছন্দ ও ভাষার বিশুদ্ধি ও নৈপুণ্য বিসর্জন দিয়া কেবল সুলভ অনুপ্রাস ও ঝুটা অলঙ্কার লইয়া কাজ সারিয়া দিয়াছে'—(রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড পৃঃ ৭১২)—এমন অভিযোগ এই গান গুলির বিরুদ্ধে কিছুতেই করা চলে না। শব্দালঙ্কারের ঘটা যেটুকু আছে তা সহজ অকৃত্রিমতাকে কখনই অতিক্রম করে যায় না।

শব্দ প্রয়োগ সম্পর্কেও এর রচয়িতারা নিরঙ্কুশ। হয়ত এক্ষেত্রেও কখনো কখনো চমক সৃষ্টির চেষ্টা আছে যেমন: তোম জুদা হোকে খোদাই দরখৎ কা মেওয়া, / না খায়া কেয়া কিয়া রে ভাই বরকত না হুয়া, / আর কেয়া পুছেঙ্গে জি হাম তোমে, / আওনা আর যাওনা সেরেফ দুনিয়াকা বিচমে, / সে দিতেছে সবারে দেখ, চাহিতে না চাহিতে। (ভা.গী. পৃঃ ১০০)। এতটা না হলেও সব গানেই যেহেতু একেবারে মুখের চলিত ভাষা ব্যবহৃত তাই মাখন, রুটি, মিছরি, কল, কারখানা প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে তৎকাল প্রচলিত প্রচুর আরবি, ফারসি শব্দ এবং কোম্পানি কাপ্তেন থেকে শুরু করে প্রোটেকশান, নিউস পেপার, হাফপেনি প্রভৃতি ইংরেজি শব্দ অবাধে ব্যবহৃত। আজকের দিনে কিছুটা চমকপ্রদ বলে মনে হলেও এই ভাষারীতি ও শব্দ প্রয়োগের মধ্যেও এঁদের আন্তরিকতা প্রতিফলিত। সুরের এই আন্তরিকতার জন্যে বাংলা গীতিকবিতা আবির্ভাবের সূচনায় এই গানগুলির কিছু ভূমিকার দাবী পুনর্বিচারের যোগ্য।

৭

গানগুলি কর্তাভজাদের ধর্মসঙ্গীত, সাধারণ আসর জমানো বিনোদনমূলক নয়। স্বভাবতই তাই এই গানগুলির বিষয়বস্তু সম্প্রদায়ের মূল ধর্মীয় বাণী ও

সাধনপদ্ধতির ইঙ্গিতবহ। এই লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায়ের (এবং তৎকালীন অনুরূপ সম্প্রদায়গুলির) উদ্ভবের পশ্চাতে অন্যতম প্রেরণা ছিল ধর্মসমন্বয়। এঁদের গানেও তার ইঙ্গিত :

> ভাইরে মগ ফিরিঙ্গি ওলন্দাজ হিন্দু মুসলমান, / এক বিধা'য় গড়েচে বস্তু তায় আছে সব দেহে বর্তমান, / দেখ ছত্রিশ বর্ণ সকলকে মানুষ বলে কয়, / গ্রন্থকার লিখলে ধ'রে মানুষ একটি বইত নয়, / যদি এক অংশেতে জনম হল সকল, / আসল নকল, / বলি তবে কারে।
> দেখো ইংরাজে গড মালিক বলে, / মুযে ফরাসিরা, / হিন্দুর ঈশ্বর / মুসলমানের খোদা / বলতো এ কোন রকম ধারা, / আপন আপন ব্যভার মতন / যেবা প্রয়োজন / কার হুকুমে করে সব / পৃথক মহোৎসব / ইত্যাদি (ভা. গী. পৃঃ ৪০৪)।

সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী ছাড়াও গানটির দার্শনিকতাও বেশ উচ্চাঙ্গের। জাতিভেদহীনতা এই ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অনেক গানেই স্পষ্টত সেই কথা :

> নিত্য যে ধাম সে কামনা-অতীতো, / তাবত উত্তম সত্য নামে রত নিয়ত, সমতা মত যাবত, / আনন্দেতে ভাসিত সদাই / সে দেশের মানুষে মানুষে ভেদ নাই, / আর অতিশয় কোমল নির্মল রীত চরিত।
> (ভা. গী. পৃঃ ১৬)

অথবা, ভেদ নাই মানুষে মানুষে, / খেদ কেন ভাই এদেশে, / দেখ হে স্বভাবে সহজে বুঝে, / দেশে অশেষ প্রকার, / মানুষে মানুষে ব্যবহার, / আচার বিচার সেই সবাই বসে। (ভা. গী. পৃঃ ২৭)।

এছাড়া এঁদের সম্প্রদায়গত সাধনভজন ইত্যাদির কথা অনেক গানেই আছে :

> শ্রীগুরু নাম অমৃত সেবন, / করহে সব বন্ধুগণ, / বিশেষণ স্মরণ মনন নিরীক্ষণ, / তত্ত্ব উপাক্ষণ ভক্ত সে ভাজন / জ্ঞান হৃদিপদ্মে সর্বদা ধারণ, / ঐ নামরস পরশ হলে বশ জানিবে ত্রিভুবন।
> (ভা. গী. পৃঃ ৩৩)

অথবা, উপাসনা তত্ত্ব পরমার্থ বর্তমান, / প্রবৃত্তি প্রবর্ত দশা বস্তুর সন্ধান, / দেহে ইন্দ্রিয়গণ, / করি সুপালন / মন একাধারে রাখিয়ে মিলন, / আর রাগানুগা আজ্ঞাসেবা হয়ে সদা সচেতন। (ভা. গী. পৃঃ ৩৩)।

সহজিয়া সুলভ পারিভাষিক শব্দাবলী অনুমান, বর্তমান, ভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ইত্যাদি এমন বহুগানেই আছে। এমন বেশ কিছু গানে সহজিয়া সম্প্রদায়গুলির মধ্যে প্রচলিত গুরুনির্ভরতা, মানব মহিমা উপলব্ধি, প্রতিবাদী মনোভাব প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়। (৩য় অধ্যায়ে সঙ্গীত নিদর্শন সহ বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।) তবে অনেক গানে তান্ত্রিকপদ্ধতি বিষয়ক পারিভাষিক শব্দাবলীর ব্যবহার

থাকলেও এই পদ্ধতির নিখুঁত প্রয়োগ কর্তাভজাদের মধ্যে ছিল কিনা সন্দেহ। একটি গীতে শুক্রবারের মাহাত্ম্যের ইঙ্গিত আছে: তাঁর হুকুমে শুক্রবারে সৃষ্টির উৎপত্তি ইত্যাদি (প্রথম চরণ: মর্ম্মটি হবে তার বুঝিতে। ভা. গী. পৃঃ ৪১০)। শুক্রবারের গীত নামে আরও একটি গীত আছে, অপর নাম দায়িক মজলিশ। এটি আনুষ্ঠানিক গীত। সম্প্রদায়ীদের শুক্রবারের বৈঠকের সূত্রপাতে এই গীতটি গাওয়া হয় অনেকটা খ্রীষ্টানদের Confession of sin এর অনুরূপ।

এমন আনুষ্ঠানিক গীত বা সম্প্রদায়গত শব্দাবলী কর্তাভজাদের গীতাবলীতে কিছু থাকলেও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা কর্তাভজাদের মধ্যে কোনো দিক দিয়েই নেই, না এঁদের মূল মর্মবাণীতে না এঁদের আচরণে। এই মনোভাব গীতগুলির মধ্যেও প্রতিফলিত। সার্বজনীন উদার অধ্যাত্ম চেতনা এই গানগু'লর মধ্যে রীতিমত লক্ষণীয়:

> বন্ধু ভবসিন্ধু-কারাগার, / কেমনে হইবো পার, / কি প্রকার এবার আর পাইব নিস্তার, / দেখ সবে একি বিষম দায়, / হায় কি হইবে উপায়, / কাল গেলো না কাল এলো, / জঞ্জাল হলো ভাই এ সংসার। যাবত জীবত এই মত সবিশেষ, / ভাবিত নিয়তো হিতউপদেশ, / কায় প্রাণপণো সচেষ্টায়, / যায়না মনের সংশয়, / হয় কি না হয় প্রায় সদা ভয়, / নিশ্চয় কি হবে তার। ইত্যাদি (ভা. গী. পৃঃ ১)

গানের মূল বক্তব্য যাইহোক, বাহ্যক যে রূপের আড়াল দিয়ে এগুলি ব্যক্ত তার বৈচিত্র্যও কম নয়। মাতৃবন্দনার বেশ কিছু গীত আছে যেগুলি স্বভাবতই শক্তিপদাবলীর কথা স্মরন করায়:

> একবার আয় গো মা ব্রহ্ম সনাতনী, / পড়ে ঘোর তরঙ্গে ডাকি গো জননী, / দীন তারিণী জগৎ জননী, / হৃদি পদ্মেতে উদয় হও জননী, / আমি অতি মূঢমতি ভজন জানিনা, / হৃদিপদ্মে উদয় হয়ে দাও মা চেতনা, / আমার সদাই চিন্তে / চিনতে ঐ চরণে / নামের গুণে পাব চিন্তামণি। ইত্যাদি (ভা. গী. পৃঃ খ)।

শাক্ত..গীতের অন্য দিক, উমার সঙ্গে বুড়ো শিবের বিয়ের কথাও (স্মরণীয় অন্নদামঙ্গল) আছে বেশ কয়েকটি গানে:

> শুনলেম মেনকা তোমার জামায়ের রঙ্গ, / কাল বিয়ের বেলা খ্যাপা নাকি হয়েছিল উলঙ্গ, / ঘরে ঘরে এই কথা হচ্ছে প্রসঙ্গ, / দেখ সকলেতে করছে গণ্ডগোল, / বলছে ঐ গিরিরাজার জামাইটি পাগল, / তার রূপের জটা দেখলে পরে, / ভয়েতে কাপে অঙ্গ। ইত্যাদি (ভা. গী. পৃঃ ৪১২)।

খুটিয়ে বিচার করলে এগুলিকে কিঞ্চিৎ সহজিয়া মনোভাব বিরোধী মনে হতে পারে। কিন্তু কর্তাভজারা লোক মধ্যে লোকাচার মেনে চলেন। তাই এই

গানও কর্তাভজা গীতাবলীর অন্তর্ভুক্ত হতে বাধা নেই। এই প্রসঙ্গে নির্ভেজাল গৌরাঙ্গ বন্দনার পদগুলি স্মরণীয়:

> নিস্তার যে করতে এলে দীনদয়াল হয়ে, / ফিরে ঘৃণা করতে পারে কি সে গরীব কাঙ্গাল দেখিয়ে, / দয়া কি ভাই আর তার হয় না মুখ চেয়ে, / সে উত্তম বই অধমের যদি নয়, / ফিরে আর কে বলবে তারে দীন দয়াময়, / তবে ডোর কৌপীন সার করেছে সে, / বল কিসের লাগিয়ে। ইত্যাদি (ভা. গী. পৃঃ ৪৩৬)।

গানটি অবিমিশ্র গৌরাঙ্গ বন্দনার হলেও এর মধ্যে তাঁর দীনদয়াল, কাঙ্গাল গরীবের প্রতি প্রীতি ইত্যাদির দিক প্রাধান্য পেয়েছে। এতে এইসব লোকায়তধর্ম উদ্ভবের মূল প্রেরণার ইঙ্গিত আছে। গানগুলির মধ্যেকার কবিত্বগুণও উপেক্ষণীয় নয়।

আর এক ধরণের গান আছে যার মধ্যে ঈশ্বরের দুষ্প্রাপনীয়তা এবং তাঁকে পাবার জন্যে ভক্তের আকুতি নারীর প্রতি প্রেমময় পুরুষের (নাগরের) ছলনা এবং নারীর আকুতির রূপ ধরে প্রকাশিত। ভাবের গীত-এ এই গানগুলি বসন্তবাহার শীর্ষনামের অন্তর্ভুক্ত এগুলির নাম কেন বসন্তবাহার বলা দুরূহ। গানগুলির মধ্যে তৎকালীন কবিসঙ্গীত ইত্যাদির কিছু ছায়াপাত লক্ষণীয়। গানগুলির মধ্যেকার সহজ কবিত্ব পাঠকের মনকে নাড়া দেয়। একটু নমুনা দিই:

> বলবো কি ওগো সখি নাগরের কথা, / দেখতে দেখতে ফাঁকে ফাঁকে নজর হতে যান কোথা, / কতবা ছুঁতো আর নতা, / কি কহিব বঁধুর ফাঁকি, / লেখা জোখা রাখবো কত আমি একাকী, / আর গোঁসাই গোঁসাই করে কবে নিরন্তর পাই ব্যথা। ইত্যাদি।
>
> (ভা. গী. পৃঃ ৫৬)।

এই গানগুলিতে নায়িকা হিসাবে রাধার নাম নেই। কিন্তু কৃষ্ণলীলার অন্তর্গত কিছু গানে অনুরূপ ভাব রাধার নামেও প্রকাশিত। (দেখ ছি হে রসিক নাগর তোমার ভারিভুরি ইত্যাদি গীত তুলনীয়। (দ্র. ভা. গী. পৃঃ ৪৬৯)।

কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গানগুলিতে কৃষ্ণের বিচিত্রলীলা, প্রভাতী গোষ্ঠ, জন্মাষ্টমী, রাসলীলা প্রভৃতি কর্তাভজাদের রীতি ও ভাষায় বর্ণিত। কদাচিৎ ভাষায় বৈষ্ণবপদাবলীর প্রতিধ্বনিও শোনা যায়। যেমন: আমি ত কাতরা অতি ধীর, / পাথর হইলে ফেটে হত চৌচির, (ভা. গী. পৃঃ ৫৫)। তুলনীয়: এত না সহিল অবলা বলে / ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে (চণ্ডীদাস)। অথবা, ওহে শ্যাম তোমায় কি আর বলিব আমি / যে রতন ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি (ভা. গী. পৃঃ ৪৯২)—তুলনীয়: কি দিব কি দিব বন্ধু মনে করি আমি / যেধন তোমারে দিব সে ধন আমার তুমি (যদুনাথ দাস)। এই

কৃষ্ণলীলা গীতিগুলির মধ্যে কৃষ্ণের দানলীলা, নৌকালীলার কিছু আভাস, এমন কি বাঁশীচুরিরও ইঙ্গিত আছে। কিছু গানে বড়াই বুড়ির উপস্থিতি কৌতুহলোদ্দীপক। বড়াই এর আকৃতি ও প্রকৃতি বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের বড়ায়ির কথা স্মরণ করায়।

সহজ সরল কবিত্ব গুণে ও গভীর আন্তরিকতায় যে গীতিগুলি পাঠকের মনকে সব থেকে বেশি টানে সেগুলিতে মনের মানুষের কথা আছে। ভাবের গীত-এ এগুলি মনের মানুষের সাট এই শীর্ষনামের অন্তর্ভুক্ত :

> কাজ কি সই মনের মানুষ বাইরে বার ক'রে, / সদা নিত্য সুখী হয়ে আত্মায় মিশাইয়ে / বসাইয়ে রাখবে হিয়ার মাঝারে, / কিজন্যে বা এক্ষণে আসবে সে বাইরে, / তার ইচ্ছা যেমন হচ্ছে তেমন মন আছে রাজী, / নইলে কি তারে ভুলে, একালে করতেছি রাজ্যি, / ক'রে সাধ্যসাধন পাবে যে ধন, / রাখবে তারে আদরে।
>
> ওরে মন কি জানে মনের মানুষ কেমন রীতি, / তা জানলে কি দেখতে পেলে, দেয় বলে এমন আকৃতি, / তারে মন জানে না আছে জানা সে রূপ মাধুরী, / ইত্যাদি (ভা. গী. পৃঃ ২৪২)।

এই মনের মানুষ অবশ্যই সহজিয়াদের মনের মানুষ। তবু হেঁয়ালিমুক্ত এই আন্তরিক উচ্চারণে আধুনিকতাও সহজলক্ষ্য। সুকুমার সেনের এই মন্তব্য : 'তবুও বলব এ গানগুলিতে সেকালের বাংলা গীতিকবিতার প্রাণস্পন্দন আছে যা রবীন্দ্রনাথের আগে আর কোথাও পাইনি।' (বিশ্বভারতী, ১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।)—যদিও সমগ্র কর্তাভজা গীতাবলী সম্পর্কে, তবুও মনে হয় এটি সব থেকে সুপ্রযুক্ত মনের মানুষ বিষয়ক গীতিগুলি প্রসঙ্গে। এই মনের মানুষেরই দেখা পাওয়া যায় বাউল গানে :

> দেহের মধ্যে আছেরে সোনার মানুষ ডাকলে কথা কয়
> তোমার মনের মধ্যে আর এক মন আছে গো।
> তুমি মন মিশাও সেই মনের সাথে,
> দেহের মধ্যে আছেরে মানুষ ডাকলে কথা কয়।

এরই বিবর্তন পথে দেখা দিয়েছে রবি-বাউলের গানের মনের মানুষ :

> আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় আমার মনে,
> সে আছে বলে
> আমার আকাশ জুড়ে ফোটে তারা রাতে,
> প্রাতে ফুল ফুটে রয় বনে আমার বনে ॥

অথবা কে সে আমার কেই বা জানে কিছুবা তার দেখি আভা
কিছু বা পাই অনুমানে, কিছু তাহার বুঝি না বা। ইত্যাদি

সংযোজন—৩

নির্বাচিত গীতি-সংগ্রহ

[গীতিশেষে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যেকার বর্ণ বা সংখ্যা, ৺মন্মথলাল মিশ্র প্রকাশিত ভাবের গীত চতুর্থ সংস্করণের পৃষ্ঠাঙ্ক নির্দেশক।]

১। শুভদে ও শুভঙ্করী ত্বং নারায়ণী, এমা বরদে-সাবদে শ্যামা অভয়া, ভবভয় ভঞ্জিনী, দীনদয়াময়ী তারা দীনপালিনী, অপার মহিমা মা তোমার, তোমা বিনে দীনে কে করে নিস্তার, আর তারণতরী তোমার ঐ চরণ দুখানি।

(মা) ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা—ব্রহ্মরূপিণী,—ত্রৈলোক্যতারিণী তুমি গো—মা-মোক্ষদায়িনী, করুণানয়নে ফিরে চাও, মম দীনহীনে কাতরে তরাও, আর নিরঞ্জন গুণসিন্ধু মনোরঞ্জিনী।

(মা) আমি অতি মূঢ়মতি দীন হীন জ্ঞান, না জানি ভজন সাধন ধ্যান, নিজগুণে তারা কর ত্রাণ, অতিশয় ভবভয়ে কাতর হয়ে, অবিশ্রান্ত ডাকি তোমারে, মা তরাও বলিয়ে, তব পদ যে করে স্মরণ, কি করিতে পারে দুরন্ত শমন, আর শমন-ভয়ে তুমি রক্ষা কর জননী।

মা, তুমি তন্ত্র তুমি মন্ত্র তুমি সারাৎসার, তুমি ব্রহ্ম তুমি গো ধর্ম, ক্ষম জন্ম অনিবার, অনুপম গুণধামা গুণের নাই সীমা, অখণ্ড মণ্ডলাকার গো মা ঐ নামের মহিমা, ভ্রমেও তোমার নাম যে লয়, তুমি তারে দাও মা, পরম আশ্রয়, আর সৃষ্টি স্থিতি পালন কারণ ত্রিগুণ-ধারিণী, আর শশীলাল কয় ঐ চরণ বই কিছুই না জানি। [ঘ]

২। অপরাধ মার্জনা কর প্রভু, এমন মতভ্রম জন্ম-জন্মান্তরে, তোমার সংসারে, হয়না যেন কভু, বিকলে কল্লে বড় কাবু, আমার ত্রুটি কত কোটিবার, লেখা-জোখয়ে লাগে ধোঁকা সংখ্যা হয় না তার, দীনজন হইয়ে অভয় চরণ ধিয়ে, ত্রাণ পেয়েছে কত ভেয়েবাবু।

আমার পাপচয় নিশ্চয় হয় কখন, সুসারে পশারে বিস্তারে কর অগণ্য, উপাসনা পায় না পামরোত্তম, দুঃখের অন্তে সুখের চিন্তে হচ্চে মতভ্রম, ভ্রমে ভ্রম বাড়ালে ছাড় ছাড় বলে, ছাড়াতে চাইলে, ছাড়ে নাকো তবু।

নিন্দুকে, নিন্দে করে আমাকে দেখে আমার রীত, আমি বেল্লিক, তুমি সবের মালিক, বলি ঠিক, কর তার উচিত, আমার অর্থ স্বার্থ সামর্থ্য জব্দ করে নাও, আমাকে নিন্দুকের বন্দুকে সেরেস্তে রেখে দাও, আমি ভ্রান্ত দূরন্ত অন্তর, কলে বলে কল করিয়ে বলাও যে মন্তর, তুমি সবার সেব্য সবার ভাব্যভাব, ভাবের ভাবী হও তুমি রব্যরবু।

(আপন) গরজে, ক্ষীর তেজে এ রাজ্যে গরল করি পান, বিষ ত্যজিয়ে প্রেমরসে মজিয়ে বসিয়ে, আছেন ভাগ্যবান, আমি আপ্তসুখী হয়েছি, ডুবিয়েছি ডিঙ্গে, একবোলে ভাসতেছে সকলে এই প্রেমের তরঙ্গে, আমি ডুবতে ডুবতে থাকি

খেতেছি, কর্ম ফলে অসমকালে জব্দ হতেছি, ডুবে তলিয়ে নীরে, কালের সংখ্যা করে, আছি ধরে দণ্ড পলের তাবু, লালশশী বলে কালের সংখ্যা করে আছি ধরে, দণ্ড পলের তাবু। [গ]

৩। দেখচি কত কিস্তি নজরে, যাচতেছি এক এক কোরে, সহরে বন্দরে ধারে হে ধারে, যায় ঠিকানা আপনা গরজে, হয়না দেখ না বুঝে, কত বায়না করে চায় না ফিরে, সয়নারে ভাই আমারে।

সবে আনন্দিত ভাবিছ আমি যে, এমত দুঃখিত কেহ ত নহে সুখ পেলে বুক বলে সবারি, দুঃখ ঘটিলে কি করি, যায় হেন প্রাণ, রয় যেন মান, হয় তো প্রমাণ অন্তরে।

তাঁর এ ঘাটে সে ঘাটে দেখতে পাই বটে, খাজনা ঘেটে ভাড়াটে বোম্বেটে, ভাই তাই বা কৈ পটে, সারো কতকগুলি তরণী যে ঠাঁই ঠাঁই, আমদানী রপ্তানী জিনিস বোঝাই, যাবতীয় নিশানি সদর, সব কোম্পানীর বহর, পাঁচ প্রকারে এক ধারে, কারবার করে সে ফেরা ফারে,—শশীর সুধা ক্ষরে, আর ঘেরে তিমির নাশ করে। [২]

৪। আসতে না হবে যেন ভবে পুনর্বার, কোন দেশে বসতি হবে কিমতে কোন অধিকার, কিবা তার আচার বিচার, সম্ভব অযোনি কি যোনি, কবে বুঝে শুজে তবে বৈরয মানি, আব জানিব শুনিব যদি ভবনদী হব পার।

মহাজন চরণ স্মরণ লয়ে, পাওনা দেনা উভয়ে মিনাহ দিয়ে, ভালো ভালো এই ত উপায়, সকল কুশল হলো গেলো যত দায়, আর বলো দেখি অতঃপর সে দেশের সমাচার।

সে নিত্য দেশে বাস করিতে মনে বড় সাধ, অধরেতে ধরিব প্রসাদ সবে কর আশীর্বাদ, আমার মনের আঁধার এই বারে ঘুচিলো বুঝ, কৃপাধারে সুসারে ভাই জিত হলো বাজি, সে ভাব বুঝিব অতঃপর, কবে যাবো কবে যাবো ভাবি নিরন্তর, আর শশধর পূর্বাপর গগনেতে অনিবার। [১০]

৫। চাইনে ভাই কোন মতে নির্বাণ হতে, সেই নিদারুণ অদর্শনো সাধারণে যাইতে, এমন স্মরণ লইতে, কিবা কাজ দেখনা বুঝে, চকোচকি দেখা-দেখি নাইকে যে রাজ্যে, আর না বুঝে সুজে তেজে এ প্রাণ মজাইতে।

আমি আশাভরে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি বিচারেতে কর চাতুরি, যদি তুমি সুজন হতে, এ অধীন জনাকে বিধান কহিতে, আব সহজ দেশের কথা, বিশেষ জানাইতে।

এই যে দেশে পতন নাইকো সেই দেশেতে যাবো, যতনেতে বসতি করিব, ভাই সুখেতে থাকিবো,—আমি পরম্প্রায় শুনেছি সহজ সুধাম, অভিপ্রায় জেনেছি সে রাজ্য নিষ্কাম, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ যাতে হয়, এ বঞ্চনা তাহাতে উচিতো কভু নয়, আর সুধাময় শশী হয় সদাই গগনেতে। [১১]

৬। নিত্য যে ধাম কামনা-অতীতো, তাবত উত্তম সত্য নামে রত নিয়ত, সমতা মত যাবত, আনন্দেতে ভাসিত সদাই, সে দেশের মানুষে মানুষে ভেদ নাই আর অতিশয় কোমল নির্মল রীত চরিতো।

সে সহজের রাজ্যেতে আজব কারখানা, সে দেশেতে কে যেতে পাবে ঠিকানা, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হলে তায়, কচি ছেলে পিছুলে পিছলে সেই মুলুকে ধায়, নয় ক্রমাগত ভ্রমণ করে হয় কি অন্ত সে পথো।

তুমি এ দেশেতে ভঙ্গ দিয়ে সে রাজ্যেতে যাবে, সঙ্গ ছাড়া পথেতে দাঁড়াবে, তারা রং দেখে তাড়াবে, সে নিত্যধামে পতন নাহিক কখনো, হেম জিনি বরণ সমতা গুণো, বৃথা এতে দেখ কল্পনা, রূপভেদ থাকিতে কেহ ত লবে না, আর শশীভাবে, নিশি হলে, দশা যাবে তবেতো। [১৪]

৭। অভেদ কেমন বচনে, বিচ্ছেদ হে কেন জনে জনে, না জেনে না শুনে কানে, বিনা সন্ধানে মানুষে মানুষে অন্যথা হলো। দেশে দেশে, সরসে বিরসে সমতা বল কিসে, বিত্তয় আশয় প্রত্যয় কভু না হয়, হয় নয় তবু হয় কোণে কোণে।

গোলোকের নাথে লোকের সাথে তুলনা উচিত নয়, অতুল সহিতে তুলনা দিতে বল না কিমতে হয়, সৃজন পালন নিস্তার কারণ যে, সন্ধান বিধান তাহার হে জানে কে, সাধু হৃদয়ে উদয় যদি গোসাই, তাই হয়ে বসেছ কি মনে মনে।

অনিত্য জীবন সার্থক জ্ঞান যথার্থ হে কোন মতে, প্রকৃত বচন পৃথক ধ্যান জীবত ভুবনেতে, জান পরস্পর তিন লোকের স্কুণ্ণ স্বভাব আচার, গুণ রূপ স্বর গঠন আর ভিন্ন ভিন্ন সবাকার, বেদ্য ক্রমাগত উপস্থিত যা যথা, অভেদ উপমা দেখেচ কেবা কোথা, দুজন সমান নির্মাণ প্রমাণ নাই, ভাই দেখ বর্তমান স্থানে স্থানে, ভাই শশী নিশি ভানু দিনে দিনে। [২৩-২৪]

৮। ভেদ নাই মানুষে মানুষে, খেদ কেন ভাই এ দেশে, দেখ হে সহজে স্বভাবে বুঝে, দেশে দেশে অশেষ প্রকার, মানুষে মানুষে ব্যবহার, আচার বিস্তার সেই এই সবাই বসে।

ন্যায় অন্যায় অভিপ্রায় হে যাতে, পরম্প্রায় ভ্রম যায় বিষয় মতে, ধন্য সব মানব-হৃদয়, ভিন্ন ভাব সম্ভব না হয়, ভাবত তাবত নিত্য নারী পুরুষে।

বিশেষণ প্রয়োজন কর বিচক্ষণ, স্বজন কারণ ধন আর উপার্জন, ভূপাল কৃপাল দয়াল ফল যে, সেহ কাল এহ কাল পরকাল সে, বিশ্বাসে প্রকাশে সর্বদায়, মানুষে মানুষে পরিচয়, আশ্রয় নিশ্চয় এই সবাতে সাজে, উদয় শশীর সুধা চকোর সাধে। [২৭]

৯। যত তন্ত্র মন্ত্র ধ্যান জ্ঞান, সাধন মতে অনুমান, বর্তমান বিনা ত্রাণ নাহিক সন্ধান, অনুচিত ভাবিত বৃথা, আরোপিত স্থাপিত কোথা, আশায় ভাসায় তায় না হয় প্রমাণ।

অভিপ্রায় সর্বকায় আশ্রয় যথায়, এ সংশয় ভঙ্গ হয় যদি পরিচয়, আপনারে আপনি যেমন, সে জনারে তেমনি বন্ধন, স্মরণ মনন আচরণ বিদ্যমান।

এ উভয় প্রকার ঘট হয়ত নিকট, সে বিঘট অপ্রকট বিষম সঙ্কট, সে নির্বিকার আশার প্রকার নিরাকার, সবিকার প্রতীকার সবার নিস্তার, বুঝে ভজ স্বজনগণে, সহজে সহজ মিলনে, স্মরণে চেতনে দান তনু মন প্রাণ, সাধনে শশীর সুধা চকোর প্রমাণ। [৩০]

১০। শ্রীগুরু নাম অমৃতসেবন, কররে সব বন্ধুগণ, বিশেষণ স্মরণ মনন নিরীক্ষণ, তত্ত্ব উপাক্ষণ, ভক্ত সে ভাজন, জ্ঞান হৃদিপদ্মে সর্বদা ধারণ, ঐ নাম রস পরশ হলে বশ জানিবে ত্রিভুবন।

মুক্তি ছাড়া যুক্তি ভাই ভক্তির বন্ধন, তত্ত্ব পরিবর্ত অর্থ যথায় মিলন, রসময় ধাম, রস অনুপাম, নাম রসনা সম্ভব অবিশ্রাম, আর কুলে মূল মূলে স্থূল ফুলে ফল উপার্জন।

পঞ্চম প্রত্যক্ষ ঐক্য মোক্ষ বিবরণ, গুণাতীত সাধু আর সাধন, হয় রসনায় সেবন, তন্ত্র মন্ত্র ধ্যান সেই নাম রস আশ্রয়, নামেতে সকল পূর্ণ জানিহ নিশ্চয়, সকাম নিষ্কাম, অভেদ সে ধাম, কাম সুদ্ধ হয় লইলে সে নাম, আর শশী হয়ে বশীভূত প্রকাশিত সর্বক্ষণ। [৩৩]

১১। প্রেম বাজারের কারবারে, কাম-শরে ফেলালে ফেরে পেঁচ করে, মনদবে বন্দরে কন্দ যায় ফিরে, নকল বিকায় আসল ফিরে যায়, হয়ে কি সকলি বৃথায় হয় যে নয়, নয় সে হয়, সয় কি প্রাণেরে।

সেই আশা বশ বিশ্বাস শেষ বর্তিত, প্রেমরস পরশ, যদি হইতো, সৌরভে যে গৌরব ত্রিকুল, ভাব ভাবিতে হে ব্যাকুল, সেই অতুল নির্মল রস রইল কি দূরে।

সেই ভ্রমে বা ক্রমে সঞ্চার আছিল আদেশ, জন্মে কেহ মর্মে যে তার শেষ। না হ'ল প্রবেশ, যে দিতে না জানে, লতে পারবে কেমনে, কোন গুণে কার সনে সাধবে সে ধনে, একি কার ভাবের কলস, ভাব ছাড়া কি হবে বশ, সে রস, স্বভাব সিদ্ধ সাধু সঙ্গেরে, নির্যাস তিমির নাশ শশী সঞ্চারে। [৩৫]

১২। সহজ কেমন জাতি, কোন দেশেতে বসতি, কিমিতি আকৃতি, প্রকৃতি গতি, জান বিশেষণ, কেন আগমন, পুনঃগমন কি স্থিতি।

কি অপরূপ শুভ সমাচার, জানিব সে ভাব তাবত প্রকার, কিমত আচার, নিয়মিত তার, কার সহিত পিরীতি।

কোন কুলেতে বা জনম হইল, বল বল আবার বল, ভাল কে তারে আনিল, সে বা কাহার কে বা তাহার, আচার ব্যাভার সহিত কার, বিদেশী জন, এ দেশে কেন, দীন শশী ত অকৃতি। [৪৩]

১৩। রসিককে বশ করবো সে কি দায়, যার রস বিনে নাহি উপায়, সে

ভাজন প্রাণ রসের আশ্রয়, সুজনে সুজনে পরিচয়, হয় ত অভেদ হৃদয়, যার লাগি যার প্রাণ কাঁদিবে সে কভু তা ছাড়া নয়।

কামাদি ছয় রিপু ইন্দ্রিয়গণ আর, পরস্পর যে যাহার হবে নির্বিকার, সে চেতনভাব স্মরণ, প্রাণপণে যতন, এই ভাবঘোরে ঘুরায়ে তারে মিলাইব আপনায়।

দেখ পৃথক রস বীজ ঘটিতে ক্ষেত্রে ইক্ষু হয়, বীজে বীজে শোধ রাখিয়ে সাধু কারখানাতে যোগায়, ছয়জনা বার করে রস উভয় পাকেতে, ছয় হাড়িতে পাকিয়ে সে রস সারে একেতে, আরো তাহে শেহলার জল, ফের পাকেতে হয় নির্মল, চাঁদ কল জানিলে ছল খাটে না, ভজতে কি বিলম্ব তায়। [৪৯]

১৪। সয় কি নারীর প্রাণে এত যন্ত্রণা, দেখ দেখি ওগো সখি ফাঁকি-জুঁকির মন্ত্রণা, রসেতে কত বঞ্চনা, যে যার শরণাগত হয়, চাতুরী উচিত তার কদাচিত নয়, আর রসিক হয়ে কেহ করে কি এ বাসনা।

আমি ক্ষণে ক্ষণে আনমনে করি গো রোদন, জেনে কি জানে না সে মনের বেদন, বুক বিদরে থাকতে গো নারি, হিয়ে চিরে দেখতে চাও ত দেখাতে পারি, আর দিবানিশি এ চাতুরী, তবু করি ঘোষণা।

দেখ পাকে পাকে রসিক বঁধুর ফাঁকি জুঁকি, আপন চক্ষে দেখতে যদি সখি, তবে জানতে কেমন থাকি, আমার রয়ে রয়ে উথলে হিয়ার মাঝে, বুঝাইব কি বলে যে নাহিক বুঝে, এ নিদানে বঁধুর কাছে সই, মনের সাধ সাধিব যদি প্রাণে বেঁচে রই, আর নিশির যোগে শশীর আগে, রসের ভাগে রসনা। [৫৭]

১৫। বাহয়া কি তোফা তোফা মেওয়া, ছিল কোন মুল্লুকে দেখ খোদা লোকে দেলায়া, পলকে পলকে ভাই দেলত খুসী হুয়া, বাহয়া কি ভাই তাজ্জব কারখানা, হায়রে হায় এমন মজা হয়নাকো হবে না, এই মনের সাধ পুরাতে এ কি বিধি লোকে মেলায়া।

ভাই ত্রিখণ্ডের মধ্যেতে এ মহীমণ্ডলে, সে কালে একালে লোক দেখনা সকলে, হালসে বেহাল নাস্তা নাবুদ হয়ে, বল্লে সে ফলের কথা তাই শুনে মন দিয়ে, এই ধর ধর বলে, ভাই কহিত না বোলায়া।

পাঁচ পরদা সে মেওয়ার খোসা তার ভিতরে আঁটি, তাতে ছুটি মোলাম পরিপাটি, ভাই বলে দিলাম খাঁটি, বৃক্ষ হতে আনিবে থাকতে ফলে ফুলে, পাকিবে সে আপনা হতে যত্নেতে রাখিলে, ফুলটির পাঁচ পাপড়ি আর এক বোঁটা, তাইতে সুজন রে ভাই হয়ত মিঠে খাটা, তার পঞ্চপল্লবেতে দেখ বল্লভকে ভুলায়া, আর শশী বিনে সব, দেলকা কপট খেলায়া। [৬৫]

১৬। সার কর মন গুরু করুণাসিন্ধু চরণযুগল, ও যদি ভবে এসেছে, যাতে হইবে এ জনম সকল, ত্রাণ হবার যদি জান কল, মনে কর এ ঘোর পাথার, শ্রীগুরু বিনেরে ভাই কে করে নিস্তার, বল বুদ্ধিসাদ্ধি মাত্র, ভেবে দেখ সেই কেবল।

আশী লাক্ষ বার এসে দেশে সকলের পেলে আশীর্বাদ, সাধের সাধনে মনরে

পুরাও মনের সাধ, তারে তুমি মনে কর মন, যার তুমি হয়েছ অতেজ্য পরিজন, সে কাল একাল কালে কালে, রক্ষা করে যে অটল।

অন্য বিষয়েতে আছ যতক্ষণ, ক্ষান্ত হয়ে চিন্তা কর মন, ওরে শ্রীগুরু চরণ, যে পদ স্মরণে রে ভাই ভ্রান্তি যাবে, তারে না ভেবে কি মতে বল পার হইবে এই ভবার্ণবে, অকাতরে করুণা করে সে বিনে আর কে আছে ত্রিকুল সংসারে, তারে ভাবলে প্রফুল্লিত হয় হৃদি পদ্মদল।

ও সেই গুরুর চরণ স্মরণ লইয়ে, কামনাদি ক্ষমা করিয়ে সেত গেল পার হ'য়ে, যদি মন সেই গুরুর চরণ একান্ত করতে পার সার, তবে আর ভবে পারের জন্যে ভাবনা নাই তোমার, যারে কৃপা করেন তিনি, তুচ্ছ সেই ব্রহ্মপদ হয় তখনি, গুরু পাদপদ্মে শশীলালের সকল ফলাফল। [১১২]

১৭। তোমরা কেউ দেখেছ হে ভাই, বলে বারপানীর উপর হচ্ছে বহুত রোসনাই, তাই আমি সুধাই, লোক করতেছে গুজব, দেখেনি কেউ কখন এমন তাজ্জব, এখন যারে দেখি তারির মুখে এই শুনতে পাই।

আমি যেতেছিলাম ঢাকা সহরে, ফিরিয়ে আসতেছি এই এক আজব খবরে, আমার আক্কেলে এসে, সাঁচা যদি হয় বড় খুসীর খবর সে, আমি এমন কথা আর কখন ত শুনি নাই।

এই সহর কোম্পানীরে, বারপাণীতে যেতেছেন সব বড় সজ্জা করে, এরা উঠতেছে গে জাহাজের উপরে, বাজে আর মাতব্বর বহুত সওদাগরে, খুসীর কামান হতেছে, বুঝি সেই খোসখবরি এরা পেয়েছে, তাই ফিরে এলেম, বলি বিষয়টা জেনে যাই।

যদি অন্য খবর হবে, তবে এরা খামকা সেখানে কেন যাবে, কোন লড়াইয়ের খবর পেলে কোম্পানী, মানোয়ারী জাহাজ খুলে যায় তখনি, মনের সন্দেহ গেছে, যখন এরা কোম্পানীর জাহাজ খুলেছে, এরা এখন ভাসতে লেগেছে, দেখ ঠাঁই ঠাঁই, লালশশী বলে ভাসতেছে সব দেখ ঠাঁই ঠাঁই। [১১৫]

১৮। আসছে জাহাজেতে এক মজার সওদাগর, দফাওয়ারি বহুত তোফা নিয়ে করে বড় আড়ম্বর, এই কুঠিতে পাঠিয়েছে খবর, তারা চেয়েছে এর হাজার এক জাহাজ, উভরা করিবে সে মাল হয় যেন আন্দাজ, এর সাথে সাথে যাবে বুঝি, হাজার দুহাজার বছর।

সেই ইংরাজ আর ফরাসী করিয়ে টক ঝক, ছিল তেঁই জলের রাহা ঘাট সকল আটক, দেখ ফরাসীরা ইংরাজের কাছে, লড়িতে লড়িতে শেষে জব্দ হয়েছে, সেই খোদায়তাল্লা বসে বসে, করে দেখ কি লহর।

যত আপদ ঘুচে গিয়ে, সেই রাস্তা খোলা পেয়ে, আসতেছে সব ভাল ভাল তোফা জিনিস নিয়ে, এদের এক একখান জাহাজ হবে লক্ষ মণ, কখন ভাই

আমরা কেউ দেখিনি এখন বুঝি এখন সে সব থাকিবে বাহিরে, উভরা হইবে তবে আসবে সহরে, যত তোজ্জারের মধ্যেতে এরা, দেখতেছি খুব মাতব্বর।

এরা এনেছে যে মাল রে ভাই জাহাজ বোঝাই করে, আলো হয়ে রয়েছে গিয়ে দেখ জলের উপরে, হয়ে কি তোফা রোসনাই দিয়েছে বাহার, জাহাজে আর জাহাজে হয়েছে গুলজার, গিয়ে এক্ষণেতে সেইখানে থাকি, ইচ্ছা হয় যে বসে বসে ঐ মজা দেখি, যেন মালুম্ হয় জলের উপরে বানিয়েছে আজব সহর, লালশশী বলে জলের উপর, বানিয়েছে আজব সহর। [১১৬]

১৯। থাকতে কেউ পায় না বটে ঢাকা সহরে, তবে তুমি ছিলে যে সেখানে, বল কিমত প্রকারে, একথা ভাই বুঝাও আমারে, এ মুলুকে লোক আছে যত, সেখানে ত গতিবিধি হচ্ছে নিয়ত, আর একথা বলে ত সকলেতে হাটবাজারে।

এক ফল আনিয়ে ভাঙ্গিয়ে দেখলাম আমি, প্রমাণ হইল রে ভাই বল্লে যা তুমি, আলমবাজার বড় মজার ঠাঁই, ইহার মধ্যেতে রে ভাই আছেন সবাই, আর কতক ঢাকায় কতক ডাঙ্গায় আর কতক ডহরে।

তুমি দেখেশুনে রেখেছ ভাই কলমবন্দী করে, বাসিন্দে লোক এই আলমবাজারে, ভাই আশীলাথ প্রকারে, দেখ গতিবিধি কত্তেছে লোক সহর পানেতে, কেউ ত সেখানেরে ভাই পায় না থাকিতে, তুমি বল ছিলাম ছয়মাস, কিমতে এমন কথা হইবে বিশ্বাস, আর যত কিছু লেখাজোখা হয় এক প্রহরে।

ভাই সে দেশেতে ছয় মাস বসতি কোরে তুমি, কেনবা এসেছ ভারত ভূমি, তাই জিজ্ঞাসি ভাই আমি, ভাই এখানকার লোক সেখানে থাকিতে বারণ, তোমারে যে রেখেছিল বল কি কারণ, এত জবরদস্ত কি তুমি, তবে ত ভাই করবো সবে তোমার পয়নামি, আর শশী বলে ফিরে এলে কি তার কহ রে।

[১৩১]

২০। নামটি লেখেনা কেন হাকিম দপ্তরে, যদি বিধির সৃষ্টি করলে সুদৃষ্টিতে, তোমায় বন্দোবস্তের ভিতরে, যে হাকিম সেই ঢাকা সহরে, যে দপ্তরের ভিতরে ত্রিকুল, তোমার নাম লিখিতে কি হয়েছিল ভুল, তুমি এমন কথা বল্লে কিন্তু লয়না আমার খাতিরে।

যত লহর গেয়েছিলে ভাই এইখানে ব'সে, গতাব্দি সেই আষাঢ় আর ফাল্গুন মাসে, আদ্যোপান্ত পেলেম পরিচয়, তোমার বৃত্তান্ত কিন্তু হইল সংশয়, তে'ই পুনঃ আমি জিজ্ঞাসি ভাই বল দেখি ঠিক ক'রে।

বল বিশ্বাসঘাতক পাপ সাবেক যত ছিল, প্রলয়কালে পাতকী লয় হলো, পাপ গগনে রহিল, সেই ধুমের ন্যায় পাপচয়ে বিধি পুনর্বার, নিরমিয়ে কল্লেতাতে জীবন সঞ্চার, ব্যক্তি নকল মুক্ত হলো ভাই, পাপচয়ে তোমারে সৃজিলেন গোঁসাই, সেই বিধি এসে প্রাণপ্রতিষ্ঠা কল্লে যদি তোমারে।

দেখ স্বর্গাদি নরকাদি তুই চতুর্দশ ভুবনে, ক্রমে ক্রমে এলে দেখে শুনে, স্থান হয় না কোনখানে, শেষে মহা নরকে গতি হতো বা তোমার, খামকা সেই হলো বা যেতে হাকিমের দরবার, অখিল ব্রহ্মাণ্ড ত্রিভুবন, বাকী ত নাই কোন ঠাঁই করিতে ভ্রমণ, লালশশী বলে জানলে তোমায় মফঃস্বল কি সদরে।

[১৪৫]

২১। সাধ কি ভাই আছে আমার আর কোন দফায়, যে অবধি বিদ্গধ খেপা এসে ক্ষিপ্ত করেছে আমায়, দিবানিশি ভাবছি আমি তাই, কুৎসিত আকার নির্গুণে, তবু তারে না দেখিলে রইতে পারি নে, সেই খেপাটাকে আমার আঁখি পুনঃপুনঃ দেখতে চায়।

তুমি স্থানের মাহাত্ম্য কি দেখাও আমারে, যেখানে যা খেপা চায় তা করিতে পারে, খেপার ত আর তুল্য কেহ নাই, অবিশ্রান্ত তার পিছে পিছে ধাই, আমি আপন ইচ্ছে খাসার দেশে যাব কি তোমার কথায়।

দেখ আমায় ক্ষিপ্ত কল্লে সেই খ্যাপা গুণমণি, ফিরে যখন যা বলিবেন তিনি, ভাল তাই হবে তখনি, সেই তোফার কথা আমারে বল্লে যেন ভাই, তোফা যাচতে গিয়ে পাছে খ্যাপারে হারাই, খ্যাপা যদি বিষ করে প্রদান, রসনা-পরশে হয় অমৃত সমান, তার বিধুমুখে মধুর হাসি কত সুধা ক্ষরে তায়।

সে বলেছে এক খাসা ফল আসমানে ফলাব, ফোলতে ফোলতে জগতে বিলাব, বলে সকলকে ভুলাব, আমি তাই শুনে ভাই কিছু আর বলিনে কারে, ভাবতেছি মজা হবে জগৎসংসারে, তোফা খাসা রোপণ করেছে, নিশানা আসমানে ঐ নজর হতেছে, এই শশীলালে হেসে বলে থাকলে চক্ষু দেখতে পায়। [১৫১]

২২। বাদসার সবজেক্‌ট হয়ে প্রোটেক্সন লব, স্পষ্ট ছাড়া হয়ে খাড়া খাড়া, তোর হাতনাড়া মুখনাড়াটা দেখাব, বাকীদার আসামীর ভার আপনি সব লব, এদের ভরসা দিয়ে নিয়ে গিয়ে সেই কাছারীতে, জানিয়ে নাম লেখাইয়ে প্রোটেক্সান লব এক সাথে, আর দেখতে দেখতে মুলুকেতে আপনা সিক্কে চালাব।

তুই আদ্যি কালে ঘেটেলের পেয়াদাগিরি ক'রে, কি ছিলি দেখ ফের কি হলি, বসলি তুই পুলিস দপ্তরে, এখন দেখতে মস্ত চিত্রগুপ্ত পোক্ত মুহুরী, নইলে কি রাতারাতি হয় এত মর্জিটা ভারী, টেড়া মর্জ্জি কার্য্যি যত পুঁজি, এক নিমিষে ঘুচাব।

দেখি যেথা সেথা তোর কথা হচ্ছে বলাবলি, অধঃপাতে যাক ব'লে লোকেতে দিচ্ছে গালাগালি, পরে চিত্রগুপ্ত পায় মোপ্ত দেয় লম্বা কোঁচা, ধর্ম বক সেই নাগাদ এস্তক, বড় ঠক কায়েতের ওঁচা, লোক দেখছে যেমন বলছে তেমন, তাই আমি বলি, আচ্‌কা কায়েতের বোকা খামকা নামটা হাসালি, এ সব সদরে দরখাস্ত ক'রে আচ্ছা তোরে শিখাবে।

করিস এই পুলিসে তুই ব'সে মিথ্যা লেখাপড়া, তেঁই মুলুকে নিমিকে

নিমিকে, হচ্ছে সব বেঁদাড়া, তুই জব্দ হলে সকলের তুষ্ট হবে মন, সেই জন্মে বাদশার ওখানে দরখাস্ত করবো গে এখন, তবে তোর তলবে চিঠি হবে আসবে তুই রজপুত, পাকড়ে ছক্কড় লাগিয়ে আগে তো ভাসিয়ে দেবে ভূত, দিয়ে নাক মোচড়া খাড়া খাড়া মুস্কি চড়িয়ে নেখাবে, লালশশী রচে কান মুচড়ে মুস্কি চড়িয়ে নেযাবে। [২০৪]

২৩। ক্ষান্ত হয়েছি রে ভাই এ বাণিজ্যে, ফায়দা যাতে নাইক কড়া কড়ি, ছাড়তে হলো সহজে, এদেশে আর ব্যবসা বাণিজ্য কি সাজে, চুটকে হয়ে কোন সহরে, খাটবো আড়তে গিয়ে মোট ঘাড়ে করে, আর যথাকালে দিন গেলে এক রুটি, মিলবে নাকি এ রাজ্যে।

আমি আশীলাক বার এদেশে কল্লেম ব্যবসা, তবু ত ভাই গেল না দেখ আমার দুর্দশা, আমি দেখে শুনে খেপা হয়েছি, পাওনাতে দেনার দফা রফা করেছি, দেখ সেই অবধি সহর আর বাজারে ফিরতেছি আপগরজে।

দেখ ছোট বড় যত ঠাঁই আড়ত কি দোকানে, কোম্পানীর নিশানী জিনিস বিনে, আমি মোট ঘাড়ে করিনে, দেখ যত মাল আমদানী হয় কোম্পানীর ঘরে, ছাপিয়ে কোম্পানী সেই জিনিস আড়তসই করে, তাতে ওজন কমীবেশী থাকেনা, থাকলে কম বেশী রে ভাই অমনি যায় জানা, আর মুটিয়ারা মোট গুণে মজুরী, জনে জনে পায় বুঝে।

আমার যত ল্যাঠা ছিল ভাই সব গিয়েছে মিটে, যাইনিকো আর কচকচির নিকটে, এখন ভর দিয়েছি মোটে, এখন কোম্পানীর আড়তের যে, মুটের দফাদার, রত্তিমাষা কসুর করিনে সঙ্গে ফিরি তার, আমার পাওনা দেনা সব হয়েছে রদ, করতে লেগেছি এখন মোট নিয়ে আমোদ, আর শশীলাল কপালের পিছে, ধিয়ে ফেরে না কোন কার্যে। [২১৩]

২৪। মিলবে তোর মনের মানুষ যা বলি তাই শোন, গুরুভক্তি অভিলাষে, থাকবি তক্তে ব'সে, নাম ধ'রে 'ডাকবি ওরে ভোলামন, কেন আর তার পুনর্বার করবি অন্বেষণ, তুই তক্তে ব'সে অনায়াসে পাস যদি তারে, চেষ্টা তোর করা বৃথা, খামকা দেশ-দেশান্তরে, বলে লক্ষ্মী-ভাগ্যি হয় বাণিজ্যি, তারও অধিক ক্ষেতের কোণ।

যে জন তিন ভুবনে সকল জানে ঠায়-ঠিকানা, সে লোককে মনের মানুষকে, দেখলে কি চিনতে পারনা, যদি এক নজরে দেখতে তারে তক্তে বসিয়ে, ওক্তো বরোক্ত সে ত নিযুক্ত থাকতো তোর হয়ে, আহা আদ-অনাদি গুণের নিধি, তার বাড়া কি আছে ধন।

আছে ঐশ্বর্য মাধুর্য এই রাজ্যের ভিতরে, চক্ষু মিলে দেখবি তিলে তিলে, আমি দিচ্ছি ব'লে তোরে, যারা আপগরজি তার ঐশ্বর্য সহ্য না হয়, সহজের

গরজ না বুঝে এরাজ্যে গর্জি হওয়া নয়, যে ভার দিয়েছে এ রাজ্যে তার যাতে দরকার, মনকে মন বলবে ডেকে, না থাকে তার কোন তকরার, তার মর্জিতে সব দিকেতে কোত্তে হবে নিরীক্ষণ।

কেউ বা তক্তে বসে এ দেশে করতেছে রাজত্বি, কেউ বা হাতে মালসা নিয়ে পথে, ঐ ফিরতেছে সম্প্রতি, কার সুখের ভরা কূল-কিনারায় লাগলো এসে, খাবি খায় কেউ মাঝ দরিয়ায়, প্রাণ তার যায় বা নিমেষে, কেউ ভাসছে জলে মানুষ ব'লে ডাকলে হয় উদ্ধার, বাঁচলে আর কোন কালে, ডাকিলে উত্তর পাওয়া ভার, তারে মিনি ক্ষোভে ডাকবি তবে অমনি হবে আগমন, লালশশী ভাবে সহজ রূপে, ডাকলে হবে আগমন। [২৪১]

২৫। ভাবলে কি ভাবের কথা কিছু বলা যায়, অনুভব করিতে না করিতে দেখ ভাবনা পালায়, এমতি বা বলে কে কোথায়, অনুভব ত স্বপ্নে হবে না, জপলে কি তপলে রে ভাই ভাবনা যাবে না, আর যে ফল কেহ না ভাবে মনে তা কে ফলায়।

দেখ ভাবভক্তি পদার্থ রাগানুগা যা, ভাবীজন বিহনে কিছু হয় নাক মজা, ভাব বিনা কে পাবে ঠিকানা, দেখভাই ভাবীর ভাবে অভাব থাকে না, আর ভাব ছাড়া আপগরজির সাথে, কে মিলতে চায়।

দেখ ভাবনারহিত কেহ নহে ত কখন, কদাচিৎ দেহের মধ্যে প্রাণ, ভাই আছে যতক্ষণ, দেখ বারে বারে অবতার যখন যেমন, ভাবিয়ে ভাবিয়ে সকল কল্লে নিরূপণ, শান্ত দাস্য সখ্য দেখ আর, বাৎসল্য মধুর ভাব এ পঞ্চ প্রকার, আর পরস্পরে ভাবে ভয় করে সকলে পায়।

দেখ আগম নিগম ক্রমে কি বিধি বিধানে, ব্রহ্ম নিরূপণ ক'রে ধ্যানে, দেখ হয় না কোন খানে, যে অনির্বচ নির্বচ কদাচিত নয়, ভাবী জনার উপাসনায় হতেছে নিশ্চয়, যাদৃশ ভাবনা এবে যার, সিদ্ধি হবে ত সেই রূপেতে তাহার, আর শশী ভাবে অবশ্য পাবে সেই কল্পনায়। [২৭৯]

২৬। সেইটে জিজ্ঞাসি এক্ষণে, কেউ বলতে পার ভাই, রসের সাগর কোন খানে, বল কে জানে, তারে দেখিয়ে যে দেবে, দিব অমনি তখনি ইচ্ছা যা হবে, ওরে লোকে বলচে ডেকে এসেছে সে আজ এইখানে।

চারু চৌদ্দ ভুবন ভ্রমণ করিয়ে, স্বভাবে না পেলেম ভাবে ভাবিয়ে, শুনি সাগর আর সঙ্গম, তেমনি নাকি নাগরটি রসিক তমোত্তম, (ওরে) বড় গুণের নাগর শুনেছি ভাই, এই শ্রবণে।

আমি রসের সাগর ভেবে, ঐ তল্লাসে, দেশে দেশে ফিরচি রাত্র দিবে, যত ফিরতে ফিরতে পথে পাই দেখা, নিরীক্ষণে ততক্ষণে হয় ধোঁকা, দেখি একি অসম্ভব, রিদগত আরাধ্য উর্দ্ধগতি সব, সদা মাতোয়ারা বহে ধারা, দুই নয়নে।

ভাবি সর্বদা কায়মনে, কতরকম, খানা খন্দক দেখি স্থানে স্থানে, পেয়ে ডোবাডুবি খাবি খায় যারা, অনুক্রমে মনভ্রমে মাতোয়ারা, যত খালি জুলি বিল, উড়তে উড়তে আহ্লাদে ভাসচে এসে চিল, লালশশী বলে দাও হে বলে, সে যেখানে। [৩৭১]

২৭। ইচ্ছা হয় সহজ হবো যাব সেই সহজ দেশেতে, সহজের লাব প্রসঙ্গে, উল্লাসে ভাসব ভাবের গাঙ্গে, যদ ফের দেখিব ফিরিয়ে দিব ফিরবো সাধুর সঙ্গেতে, কি দুর্লভ হয় উদ্ভব সহজ রাজ্যেতে, দেখ অবশ্রান্ত মন ভ্রস্ত শান্ত হবার নয়, দণ্ড দণ্ড খণ্ড খণ্ড পণ্ডশ্রম হয়, ভবে এ যন্ত্রণায় ভাব জনা, চায় না বসত করিতে।

যারা কর্মক্ষেত্রে কর্মেতে জন্মে অনিবার, ফোরে না তা ফুরোয় না হয় না প্রতিকার, সেইটে ভাবতে ভাবতে ভেবে চিন্তে পথে দাঁড়িয়েছি, ভাবি যেথা যাব সেথা যাত্রা করেছি, ভাবির ভাবে মিলবো ভাব মিলাব, চলো পরম বঙ্গেতে।

মানুষ মানুষী যোগীন্যাসী, সন্ন্যাসী ঋষি তপোধন, জপে জপে এ সপ্তদ্বীপে হচ্ছে বিচক্ষণ, তারা দেখতে পাচ্চে এ রাজ্যে হচ্ছে হবে যা, বারে বারে ঘাড়ে করে ফেরে সেই বোঝা, বোঝা নাড়তে চাড়তে ঘাড়ে চাপে ছাড়তে পারে না, তরে মাঝারে মজা করে তারে হেরে না, আমি সহজ হয়ে সহজ পেয়ে, দেখবো গিয়ে চক্ষেতে।

দেখ এ রাজ্যে আপগরজে যারে যে ভজে একটিবার, প্রকাশ হলে অকূল ত্রিকূলে বলে ব্যভিচার, এই যে সত্যের অন্ত স্বতন্ত্র শাস্ত্র চিরদিন, ক্রূগ্রহ শুভগ্রহ গ্রহ তার অধীন, যাদের পঞ্চভাবে বাঞ্ছা হবে করবে পরিচয়, সহজভাবে সহজরূপে লবে তার আশ্রয়, লালশশী বলে অশীত কালে, শশী এলেন সাধিতে। [৩৮৭]

২৮। সেইটে মেনকা রানী ভাবচি নিরন্তর, এমন স্বর্ণলতা গৌরী তোমার, তার কপালে বুড় বর, আলাভোলা ভোলানাথ খ্যাপা দিগম্বর, চাড়ে এঁড়ে গোরু ভাং ধুতুবা খায়, নিত্য শ্মশানে থাকে ভস্ম মাখে গায়, দিলে কেমন করে এমন বরে, চক্ষু থাকতে গিরিবর।

বলে গিরিপুরবাসী আসি শুন গো পাষাণী, কাল দিয়েচ মেয়ের বিয়ে এই কথা শুনি, ওগো গৌরী তোমার ননীর পুতলি, কল্লে কোন ঘটক এসে এমন ঘটকালি, একি কবার কথা লাজে মরি, শুনে গায়ে এলো জ্বর।

ওগো মেনকা, শুনেছি শুনেছি তোর জামায়ের কথা, শ্মশানবাসী উদাসীনের মত, তার নাই পিতামাতা, স্নান করে শিঙ্গে অষ্টাঙ্গে ভুজঙ্গে বেষ্টিত, কে বলে সেই ভোলানাথ দেবের পূজিত, দিয়ে নকুলের সঙ্গেতে বিয়ে, ফেল্লে গো অকূলেতে আদরের মেয়ে, এমন স্বর্ণ অট্টালিকে ছেড়ে, বেলতলাতে করবে ঘর, লালশশী বলে কেমন করে বেলতলাতে করবে ঘর। [৪১১]

২৯। বল্লে কি রসের কথা বোঝে সর্বজন, মুখের কথা কথরে কথা কোন কাজের নয়, নিগম ঘরে বসে দূরের খবর রাখতে হয়, এমন আস্তে আসে গরজেতে, মর্ম খোঁজে কতজন।

সহজ সুরসের কথা সুধালে তুমি, শুনিয়ে সেই রসের ঘরে পাথারে ভাসতেছি আমি, দেখ দুই লালেতে জগৎ ভাসে, এ কথা বল্লে কে মানে, দোখয়ে না দেখে যেন অন্ধ নয়নে, আর বলবো কি ভাই প্রসঙ্গটি, রসে ভাসে অনুক্ষণ।

দেখ কপাল হতে বিন্দু খোসে পড়ল অগাধ জলে, সেই হতে এক জেলে আসিয়ে বাঁধলে মায়াজালে, দেখ তাতেই জনম মরণ হয় যেন সুনিশ্চয়, জেনে শুনে নয়ন কোণে রাখতে পাল্লে হয়, কেউ অকাতরে ফেলে দূরে, জানে না মর্ম, কথার বোলে লোক জানায়ে করতে চায় ধর্ম, ভাইরে সে বিন্দুরে সিন্ধু মাঝে দিয়ে, বন্ধু হারায়ে কর্ত্তেছে তার অন্বেষণ।

দেখ সেই রসে এক নিমিষে সৃষ্টি হচ্ছে যত, উল্ট পাকে পড়িয়ে বিপাকে জীবে ঘুরছে অবিরত, আছে এর উপর এক মহাজন মানুষ রতন, যিনি বীজের বীজ সে রতন অমূল্য সে ধন, তারে হঠাৎ কারে ধরতে নারে বিনা সৎসঙ্গ, সঙ্গ হলে রং ধারিলে দেয় নাকো ভঙ্গ, রাখে কায়দা কোরে, নিমিকেরি তরে, অন্তঃপুরে হেরে সেই কিরণ, লালশশী বলে নিমিকেরি তরে, অন্তঃপুরে, হেরে সেই কিরণ। [৪১৬]

৩০। চৈতন্য রূপেতে জগৎ চেতন করিয়ে, ভক্তের ঘরে প্রতিমূর্তি রেখে, থাকলে কোথায় লুকায়ে, এখন কি করে সে গোপনে রয়ে, ভাল কি জন্যে লোক তরাইতে চায়, কি জন্যে বা ফাঁকি যুঁকি করে পুনরায়, তারে সদাশয় ভাবিয়ে ছিলাম অতিশয় কঠিন হিয়ে।

দেখ অবিশ্রান্ত শ্রবণে শুন্তেছি সবাই, অপরূপ চরিত সেই গোরা অদ্বৈত গোঁসাই, লয়ে ভক্তবৃন্দ পারিষদগণ, সুধাময় ভক্তিরস লোকে কল্লেন বিতরণ, এমন লুকোচুরি কল্লে কেন জীবে হরিনাম দিয়ে।

দেখ এক পভু দুই পভু তিন পভু কয় লোকেতে, ভক্তবৃন্দ অসংখ্য সঙ্গেতে, লেখে গ্রন্থকারেতে, সেই মহাপ্রভুর ভাবেতে মাতাল সকল লোক, অমৃত চৈতন্যচরিতামৃত হইল পুস্তক, যার চরিত্র ভেবে ভাবের উদয় হয়, এমন লোক লুকায়ে থাকে প্রাণে কি তা সয়, তারে দেখব ভেবে রয়েছি ভাই, পাষাণে বুক বাঁধিয়ে।

সেত ছোট বড় বাছলে না পেলে যখন যারে, হরিনাম বিলালে ধরে ধরে, ভাই দেখ সব লোকেরে, যত ত্রিকুলের মধ্যেতে লোক ছিল দুরন্ত, কি মন্ত্র হরিনাম দিয়ে করিলেন শান্ত, দেখ উথলিয়ে গৌর-প্রেম সাগর, এক ঢল করিল সকল ডাঙ্গা কি ডহর, লালশশী বলে ভাবতেছি তাই, আশাধারী হইয়ে। [৪২৯]

৩১। দেখ না আপন নয়নে, হরি উপনীত গোপভবনে, যদি হও মনে সংশয়ে শ্রবণে, প্রকাশ অম্বুজ রাঙা পায়, ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন তায়, ত্রিভুবন শরণাগত করুণানিধান চরণে।

স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ব্রহ্মাণ্ড গগনে, আগম নিগম তন্ত্র বেদ প্রমাণে, সর্বেশ্বর হে পুনর্বার দেবতা অসুর নরের, পালন তারণ কারণ গমনাগমন ভুবনে।

দেবের দুর্লভ হবে গৌরব ভাবের স্বরূপ যে, সবের বল্লভ যার যে ভাব তাতে, দেখ এবে মানবে, সেই তম রজ সত্ব ত্রিগুণধারী, তেঁই ক্রমাগত এত হল অবতারী, পূজেছিল হরগৌরী যে, প্রকাশিল তাহারি গৃহে, সেহে ও কীর্তন অনিবার যার শশীকণা গগনে। [৪৫৬]

৩২। আয় ভাই এই ব্রজের ধুলায় খেলিগে পরম রঙ্গেতে, তোদের মাখন দধি, আমি সব খেয়ে থাকি যদি, তবে রুটি মাখম চাবে যখন দেবে তখন মায়েতে, অতঃপর কত ক্ষীর সর দেখবে সাক্ষাতে, দেখ ধুলা খেলার বেলা বয়ে যায়, যখন পাবে তখন খাবে ভাই তবে কাজ কি সে কথায়, যত বৎস ধেনু পদরেণু লাগবে অঙ্গেতে।

শিশু রাজু বিশু মুকুন্দ চন্দ্র আনন্দ, বিরেশ্বর আর জয় জগদীশ্বর ঈশু ব্রজেন্দ্র, ঐ যে চন্দ্রচূড়া জোড়া ভূরু যার, খেলতে এসে ফিরে গেছে, বুঝি সে আসছে পুনর্বার, আর জগবিন্দু মাধবিন্দু বিধিবিন্দু সহিতে।

রাসবিহারি, সুখবিহারি যাদব হরি, হরি পরশুরাম, বসুজাসু আর রাশু ঐ যে বিশু শিশুরাম, দেখ ভাগ্যবন্ত অনন্ত কান্ত কর্ণধার, জগদীশ তারা জন একুশ বিশ হরিশ মনোহর, এরা নৃত্য কল্লে বলে ধাতিং থিং, জলধর হলধর বিহর হর আর নরসিং আর ঐ তনু মনু ধনু কানু বিরু হিরু ভাবতে।

এই যে গোকুলের, রংমহলের সকল ছেলে ডাকলে ভাল হয়, শুদ্ধভাবে নিযুক্ত হইবে তবে ঘুচবে দুঃখচয়, সেই যে নির্বিরোধি রামনিধি বুদ্ধি যার ভাল, ভাই যেটি তার মন্দ নয় একটি মুখটি প্রফুল্ল, ঐ যে যোগেশ্বরে হরে শঙ্করা, জয়কিশোরে কাশিশ্বরে গৌর আর গোরা, লালশশী রচে বেছে বেছে নাম রেখেছে ব্রজেতে। [৪৬৬]

৩৩। ওহে শ্যাম তোমায় কি বলিব আমি, যে রতন ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি, তোমার কিসের কমি, দেবাদিদেব যারে না জানে, তার সাধ সাধিবে কেবা কেমনে, তব অবলীলাক্রমে ভ্রমেতে ভ্রমি।

আসিতেছি সাথে করে পশরা তোমার লাগি, পথে যে এ সাক্ষাৎ হয় সে আমারি ভাগ্যি, তব গুণে অনুরাগি হয়ে দেখ দেখ সকলে এলাম ধেয়ে ভাবত আমরা তব প্রেমের প্রেমি।

মনে করি হে বনমালি, যা বলি দেখিলে হে সব অমনি ভুলি, ভাল তুমিত জান হে সকলি, দিবানিশি ভাবিতেছি তব এই রূপমাধুরী, শ্রীহরি শ্রীহরি নাম

স্মরণ করি, স্বর্গ আদি এ তিনভুবন, তব ইচ্ছাতে হয়েছে সৃজন, সে কারণে আগমন এই ভারত ভুমি ।

শুন শুন হে মধুসূদন শুন, লইলাম হে চরণে শরণ, যেন ভুলনা ভুলনা কখন, রসরাজ সহজ অতি সহজরূপে আসিয়ে, বঙ্কিম হইয়ে থেক মম হৃদয়ে, লুকাইয়ে রাখিব হে তোমায়, কখন যেন কেহ দেখিতে না পায়, শশী ভাবে হবো তব মর্মের মর্মি ! [৪৯২]

৩৪। রঙ্গ করিসনে মিছে হ্যাদেলো রঙ্গিনী বড়াই, তোমার যে আশাতে আসা, বুঝলাম সে সব আশা, আজ কি তাই পূর্ণ করতে পার্বেন রাই, বউ-ভাঙ্গানি তুই মাগী বলবো কি আই আই, বড়াই রাইকে তুমি নিতে এসেছ, ছল করে দুধের কেঁড়ের কথা আজ আমায় সুধাচ্চ, আবার শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যেমন, তেমনি তোমার দেখতে পাই ।

তুমি বল্লে এসে আমারে, কও দেখি কিসে গাই দোয়াই শোন গো ও বড়াই বুড়ী, সে কথা বুঝতে বাকী নাই, আমি ব্রজের মধ্যে কুটলে নাম ধরি, হাঁ কল্লে আঁতের কথা সকলি বুঝতে পারি, কেউ আমার কাছে ছাপিয়ে যাবে, এমন মেয়ে দেখি নাই ।

আমি তোমার মতন দেখি নাই এমন চতুর মেয়ে, বউকে লয়ে কালায় ভেট দিবে, আজ আমায় ফাঁকি দিয়ে তোমার মনে মনে বাঞ্ছা যা বুঝেছি সকল, বল্লিনি মনের কথা, করলি তুই উল্টো কথার ছল, হ্যাঁলো দোয়ের ডালা কে এনেছে তোর, ছুতনো তোর দেখছি ভাল, তুইতো সেই পুতনা হতেও চোর, যেমন সাত গেঁয়ের কাছে মামদোবাজী, তেমনি তোমার দেখতে পাই ।

এই ব্রজের মধ্যে তুমিত বড়াই নামটি ধর, পরের মাথায় ভাঙ্গতে পার তাল, পরের কুল মজাতে পার, তোমার অন্ত দন্ত গিয়েছে পাকলো মাথার কেশ, গেলনা তোর কুজড়াপানা এখন হদ্দ রোগের শেষ, লোকের কাছে সতীত্ব বলাস, পরের মেয়ে পরকে দিয়ে, পরম্পর লোকের ঘর মজাস, আমার অকলঙ্ক কুলে এখন তুই মাগী ত দিলি ছাই, লালশশী বলে কুলে এখন, তুই মাগী তো দিলি ছাই । [৫০৪]

৩৫। সই গো কি রাসের লীলা হচ্চে চমৎকার, বোসে দুইজনাতে মণিময় সিংহাসনেতে, হেরে আভনয়নে বাঁকার পানে ঘুচলো মনের অন্ধকার, সুরেশ্বর এসে পুরস্কার কচ্চে পুরন্দর, দেখ মন্দ মন্দ সচন্দন মলয়ার হিল্লোল, সুগন্ধে মন আনন্দ হয় সবারি নির্মল, ঘরে বড়দিদিকে ননদিকে দেওগে আগে সমাচার ।

ঋতু হীম অন্তে শিশির শেষে পেয়ে বসন্ত, তাই বুঝি এই ব্রজের মাঝে রাসেতে বসছেন শ্রীকান্ত, গিয়ে যেদিকে যে লোকেতে করছে নিরীক্ষন, সব

দিকে সবার চক্ষে হয় যুগল দরশন, দেখ দেখ এক সখী আর সখীকে বলছে ডেকে বারে বার।

কত পুণ্যবতী প্রকৃতি ভোর যুবতী মেয়ে, পূর্ণমাসী মুনির মন-বিলাসী এ যে রাসবিলাসী প্রিয়ে, দেখ ইন্দ্ররাণী চন্দ্রমণি তিলোত্তমা, কৌশল্যা বড়াই জটিলে সুশীলে কুটিলে আর ক্ষমা, রূপে বিদ্যাধরী আদরী সুন্দরী সীতা, দ্রৌপদী আর সুমতী রেবতী বিদ্যা, মণিময় জিনে বেণী সাজে মানিয়েছে কি মনোহর।

দেখ কৃষ্ণমণি রমণী রামমণি কমলা, দুর্গামণি রাধামণি জয়মণি বিমলা, আর সৌদামিণী সুধামণি সুধাপ্রিয়ে, রাইমণি ধন সোনামণি যেমনি বসেছেন আসিয়ে, যত দীর্ঘকেশা সুবেশা সুভাষা নারী, চাঁদরাণী আর নয়ানি রাজরাণী গৌরী, লালশশীর হৃদে দেখতে দেখতে, আহ্লাদের সীমা নাইকো আর। [৫১১]